ইউনিট-১

বাংলাদেশঃ একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত উষ্ণ-আর্দ্র নদী মার্তৃক ব-দ্বীপ বিশিষ্ট একটি সমভূমি। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসের একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম মাত্র ৪২ বছর পূর্বে হলেও, প্রায় পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী এদেশে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠেছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগের সাহিত্য কর্মে প্রথম বাংলা জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের উপরিভাগের দৃশ্যমান ভূ-উপাদানের বয়স কয়েক কোটি বছর। তবে এদেশের দক্ষিনাংশের বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতল ভূমির গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪ উত্তর ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্কট ক্রান্তি রেখা (২৩ ১/২° উত্তর অক্ষাংশ) বাংলাদেশের প্রায় মাঝ বরাবর অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। নদী মার্তৃক এই দেশের বুকে জালের মত বিস্তৃত রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল ও ছোট বড় নানা ধরণের জলাশয়। এই সকল নদী-নদী ও নানান জলাশয় এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। গঙ্গা-পদ্মা, ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা, সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা হাজার বছর ধরে বিপুল পরিমান পলি বয়ে নিয়ে বঙ্গখাতে অবক্ষেপন করে গড়ে তুলেছে পলল সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ সমভূমি বাংলাদেশ। মৌসুমী জলবায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অসংখ্য নদ-নদীর উপস্থিতি বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তা।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-
পাঠ ১.১: বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস
পাঠ ১.২: বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান
পাঠ ১.৩: বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ ১.৪: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

পাঠ ১.১

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাসঃ
(Chronological History of Geo-Political Evolution of Bangladesh)

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস;
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় : অবস্থান, আয়তন, সীমারেখা, ও প্রশাসনিক গঠন; এবং
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস (Chronological History of Geo-Political Evolution of Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পুরোনো বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত ও বৌদ্ধ যুগে বঙ্গদেশ অথবা বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায়। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ক্রমবিকাশের একটি চিত্র পরবর্তী অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হলো।

প্রাচীন যুগ ঃ

বৈদিক যুগের শেষভাগে 'বঙ্গ' নামে বর্তমান বাংলাদেশের কিয়দংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'বঙ্গ' শব্দটি নিম্ন গাঙ্গেঁয় উপত্যকার একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে বুঝাতো। প্রাচীন এই বঙ্গ দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানা ও জাতি সত্ত্বা ছিল। এই অঞ্চলটি পুন্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, হরিকেল, সমতট ও বঙ্গাল নামক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জনপদ বেষ্টিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশ বা বাংলার সীমানা উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে-গারো, লুসাই পর্বত হতে পশ্চিমে ছোট নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে পন্ডিতগণ ধারণা করেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩২১ সালে বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে খৃষ্টপূর্ব ৬৮ সালে টলেমী (Ptolemy) তাঁর অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গারিডই বা গঙ্গারিডাই নামে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে এক শক্তিশালী জাতির আবাসস্থল হিসেবে বাংলা অঞ্চলের উল্লেখ করেন। তবে ঐ মানচিত্র বঙ্গদেশের কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি (Sultana,S,1991)।

মৌর্য যুগ ঃ

পন্ডিতদের মতে. মৌর্য যুগে (৩২১-১৮১ খৃষ্টপূর্ব) গঙ্গারিডই ও প্রাসই নামক দুটি শক্তিশালী জাতি বাংলা অঞ্চলে বসবাস করতো। তবে গুপ্ত বংশের (৩২০-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে জানা যায় নি।

গুপ্ত যুগ(৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ) ঃ

গুপ্ত যুগের ৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ সময়কালে রাজা শশাঙ্ক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় (বর্তমান উড়িষ্যা)এবং বর্মন রাজন্য বর্গ উত্তর পূর্ব বঙ্গে একটি পৃথক স্বাধীন ভূখন্ড স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময়কালে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উত্থান ঘটে।

পাল রাজত্ব (৭০০-৯২৫ খৃষ্টাব্দ) ঃ

খৃষ্টাব্দ ৭০০ থেকে ৯২৫ সময়কালে পাল বংশ বাংলা ভূখন্ড শাষণ করে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল-এর শাষণামলে (৭৫০-৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। পাল বংশ সুদীর্ঘ ৪০০ বছর বাংলা শাষণ করে। 'মাৎস্য ন্যয়' অবস্থা ও গোপালের নির্বাচন প্রক্রিয়া এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অবস্থা।

সেন রাজত্ব (৯২৬-১২০৪ খৃষ্টাব্দ) ঃ

বাংলায় সেন রাজবংশ রাজত্ব করে ৯২৬ থেকে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ সময়কালে। এ সময়ে সমগ্র বাংলা তাদের শাষণাধীন হলেও বর্ণ বিরোধ চরম হয়ে উঠে। সেনদের রাজত্বকালে নিপীড়িত বৌদ্ধ এবং নিচু বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ক্রমশ: আরব ও পারস্য থেকে আগত মুসলিম ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের অনুপ্রেরণায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বর্হিগমন করে।

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয় (১২০৪-১২৪৫) ঃ

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় প্রথম মুসলিম শাষণ প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৪-১২৪৫ খৃষ্টাব্দ)। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসনামলে বাংলার ভূ-রাজনৈতিকভাবে একটি সুস্পষ্ট পরিচিতি লাভ

(আহমেদ, ১৯৭৫)। এই সময়কালে বাংলার সীমানা ছিল উত্তরে নেপালের সীমানা থেকে উত্তর উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। অন্যদিকে পশ্চিমে বিহার থেকে পূর্ব আসাম পর্যন্ত।

মোঘল রাজত্ব (১৫৭৬-১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) ঃ
এই সময়কালে সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বেশ কয়েকটি নগর-জনপদ গড়ে উঠে। পাটনা, মুঙ্গের, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, সোনারগাঁও, সিলেট, বাগেরহাট, চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) ও সন্দীপ এই জনপদ গুলোর অন্যতম।

বৃটিশ শাষণামলে বাংলা (১৭৬০ থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ঃ
বাংলা ভূখন্ড বৃটিশ শাষণামলে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' নামে পরিচিত ছিল। এ সময়ে বাংলা, বিহার, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যার কিয়দংশ, আসাম ও আরাকানের কিয়দংশ নিয়ে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) ঃ
প্রশাসনিক কার্যার্থে বৃটিশ শাসকেরা বাংলাকে দু'টি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করেন। তদানুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে নবগঠিত প্রদেশ পশ্চিম বাংলার রাজধানী হয় কলকাতা। তবে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার ফলে ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীতে গঠিত ' ইষ্ট বেঙ্গল' বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং কালক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশে গঠনের সূত্রপাত হিসেবে কাজ করে।

পাকিস্তান শাষণাধীন পূর্ব পাকিস্তান (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ
১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে 'পূর্ব বাংলা'-এর পরিবর্তে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নাম প্রচলন করা হয়। এ সময়কালে পূর্ব বাংলায় 'উর্দু'-কে রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে সমগ্র পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার অবদান অধিক সত্ত্বেও এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তেমন ঘটেনি। প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে বৈষ্যম্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং প্রশাসনিক বৈষম্য রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রাম (১৯৪৮-১৯৭১) ঃ
১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু' ঘোষণার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সর্ব প্রথম আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, আরও অনেক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তান বাসী।

অনেক আন্দোলন ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠীর পক্ষপাতমূলক ও অত্যাচারী আচরণ বন্ধ না হওয়ায় প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক বিশাল জনসভায় জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। পূর্ব পাকিস্তান বাসী ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই দিন মধ্যরাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবি ও পুলিশ বাহিনীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এ সময়ে ২৬ শে মার্চ মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র চট্টগ্রাম আওয়ামী লিগ নেতৃবৃন্দকে প্রচার করার লক্ষ্যে প্রেরণ করেন, যা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার হতে থাকে। ইতিমধ্যে, পরদিন অর্থাৎ ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান শেষ মুজিবর রহমান-এর পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন (বেলাল মোহাম্মদ, ২০০৬)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ। আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময় ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায়, পরিপূর্নতা লাভ করে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যূদয়ের ক্রম বিকাশ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় : অবস্থান, আয়তন, সীমারেখা, ও প্রশাসনিক গঠন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) ঃ
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা করতে হলে, প্রথমে এদেশের প্রকৃত অবস্থানের (Absolute Location) প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থান হলো এদেশের তিন দিকে ভারত রাষ্ট্র,উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার-এর অংশ বিশেষ পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত (মানচিত্র ১.১)।

বাংলাদেশের আয়তন ও সীমারেখা ঃ
বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৫৬৯৭৭ বর্গ মাইল এবং দেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪৬৮৫ কি. মি. (২৯২৮ মাইল) এবং জলসীমা ১২ ন্যটিকাল মাইল। বাংলাদেশের মোট আয়তনের মধ্যে

২২,১৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদ-নদী বিশিষ্ট এবং ১৬,৫৪২ কিলোমিটির জুড়ে বনভূমির অবস্থান (BBS, 2008) (সারণী ১.১)।

সারনী ১.১ : বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে স্থল ও সমুদ্র সীমানার দৈর্ঘ্য ঃ

সীমারেখার ধরণ	দৈর্ঘ্য কি. মি./মাইল
মায়ানমারের সাথে সামুদ্রিক সীমানা	৪৪৫ কি.মি /২৬৭ মাইল
ভারতের সাথে স্থল সীমারেখা	২,৩০৬ কি.মি./ ১৩৮৩ মাইল

উৎস্য: হারুন অর রশিদ, ১৯৯১

* ২০১২ সালে United Nations Convention on the Law of the SEA (UNCLOS) বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের ২০০ নটিক্যাল মাইল সহ ১.১১ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার অধিকার অনুমোদন করে। এই এলাকা বাংলাদেশের স্থল আয়তনের প্রায় দ্বিগুন (খুরশীদ আলম, ২০১২)।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক গঠন

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট বিভাগ। এই ৭টি বিভাগে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে।

সারণী ১.২: বাংলাদেশের বিভাগ অনুযায়ী জেলার সংখ্যা

বিভাগ-এর নাম	জেলার সংখ্যা
ঢাকা	১৭ টি
রাজশাহী	৮ টি
চট্টগ্রাম	১১ টি
খুলনা	১০ টি
বরিশাল	৬ টি
সিলেট	৪ টি
রংপুর	৮ টি
মোট জেলার সংখ্যা	৬৪ টি

উৎস্য : BBS, ২০১১

এছাড়া এদেশে মোট ৫০৯ টি থানা বা উপজেলা, ৪৪৬৬ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৫৯২২৯ টি মৌজা, ৮৫,৬৫০ টি গ্রাম, ১১টি সিটি কর্পোরেশন (গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সহ) এবং ১২০টি পৌরসভা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক একক হিসেবে মোট ২০টি জেলা ছিল। এর পরবর্তী ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক একক ছিল থানা। ১৯৮৪ সালে এদেশের বৃহত্তম জেলাগুলো ভেঙ্গে সর্বমোট ৬৪টি জেলায় উন্নীত করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি পূর্বের থানাসমূহ ও সেই সাথে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন থানাসহ মোট ৪৯৫টি উপজেলা করা হয়। এছাড়া মোট ৮৫,৬৫০টি গ্রাম ও ৬০,৩২৫ টি মৌজা বিদ্যমান আছে। ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হিসেবে ২০০৯ সালে মোট ৪,৪৯৮ টি ইউনিয়ন বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হলো উপজেলা এবং বৃহত্তম একক হলো জেলা। (BBS, ২০১০)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

রাজনৈতিক তথ্যাবলী ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ১৯৯১ সালে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে ১৯৭৫ সালে কায়েম হওয়া রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। দেশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সাল থেকে ক্ষমতাসীন রয়েছেন। সারণী ১.৩ ও ১.৪-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী গণের নামের ও দায়িত্বকাল-এর তালিকা দেয়া হলো।

সারণী ১.৩ : বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টগণ এর নাম ও দায়িত্বকাল

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট গণ	দায়িত্বকাল
সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
শেখ মুজিবুর রহমান	১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩
মোহাম্মদউল্লাহ	২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫
খন্দকার মোশতাক আহমদ	১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৭৫

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	৬ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ২১ এপ্রিল ১৯৭৭
লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান	২১ এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে ৩০ মে ১৯৮১
বিচারপতি আবদুস সাত্তার (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	৩০ মে ১৯৮১ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৮১
বিচারপতি আবদুস সাত্তার	২০ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২
বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৭ মার্চ ১৯৮২ থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৩
লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৯১
আব্দুর রহমান বিশ্বাস	৮ অক্টোবর ১৯৯১ থেকে ৮ অক্টোবর ১৯৯৬
বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ	৯ অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০১
প্রফেসর এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২১ জুন ২০০২
ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	২২ জুন ২০০২ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২
প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯
জিল্লুর রহমান	১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ থেকে ২০ মার্চ ২০১৩
মো.আব্দুল হামিদ	১৪ মার্চ ২০১৩ থেকে ২৪ এপ্রিল ২০১৩
মো.আব্দুল হামিদ	২৪ এপ্রিল ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

সারণী ১.৪: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা গণের নাম ও দায়িত্বকাল

ক্রমিক নং	প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা গণের নাম	দায়িত্বকাল
১	বেগম খালেদা জিয়া	২০ মার্চ, ১৯৯১-৩০ মার্চ, ১৯৯৬
২	মো.হাবিবুর রহমান (প্রধান উপদেষ্টা)	৩০ মার্চ, ১৯৯৬-২৩ জুন, ১৯৯৬
৩	শেখ হাসিনা	২৩ জুন, ১৯৯৬-১৬ জুলাই, ২০০১
৪	লতিফুর রহমান (প্রধান উপদেষ্টা)	১৫ জুলাই, ২০০১-১০ অক্টোবর, ২০০১
৫	বেগম খালেদা জিয়া	১০ অক্টোবর, ২০০১-২৯ অক্টোবর, ২০০৬
৬	ইয়াজউদ্দীন আহমদ (প্রেসিডেন্ট ওপ্রধান উপদেষ্টা)	২৯ অক্টোবর, ২০০৬-১১ জানুয়ারী, ২০০৭
৭	ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা)	১১ জানুয়ারী, ২০০৭-১২ জানুয়ারী, ২০০৭
৮	ফকরুদ্দীন আহমেদ	১২ জানুয়ারী, ২০০৭-৬ জানুয়ারী, ২০০৯
৯	শেখ হাসিনা	৬ জুন, ২০০৮ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্ষমতাসীন

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) ঃ

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর আদেশে ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবি ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক হারে হত্যা করে। ঐ দিন শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় (মুজিবনগর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বাঙালী পুলিশ, ই.পি.আই (বি.জি.বি), সিপাহী, আনসার সদস্য, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানী। সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালিত হয় (সারণী ১.৫ ও মানচিত্র ১.১)।

সারণী ১.৫ ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ ও সেক্টর কমান্ডারগণের নাম

সেক্টর নং	অঞ্চল (এলাকা)	সেক্টর কমান্ডারগণের নাম ও দায়িত্বকাল
১	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল, ১৯৭১ - ২৫ জুন, ১৯৭১) রফিকুল ইসলাম (২৮ জুন, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
২	কুমিল্লা - নোয়াখালী	খালেদ মোশাররফ (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) এটিএম হায়দার (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ - ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
৩	সিলেট - ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কে. এম. সফিউল্লাহ (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২১ জুলাই, ১৯৭১) এ.এন.এম. নুরুজ্জামান (২৩ জুলাই, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১)
৪	সিলেট ঃ হবিগঞ্জ অঞ্চল	চিত্তরঞ্জন দত্ত (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) আব্দুর রব
৫	সিলেট ঃ দুর্গাপুর - ডাউকি-এর পূর্বসীমা	মীর শওকত আলী (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৬	রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ	এম খাদেমুল বাশার (এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৭	দিনাজপুর - রাজশাহী - পাবনা - বগুড়া	নাজমুল হক (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) কাজী নুরুজ্জামান (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২), আব্দুর রব

চিত্র ১.১ ঃ বাংলাদেশর অবস্থান ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ

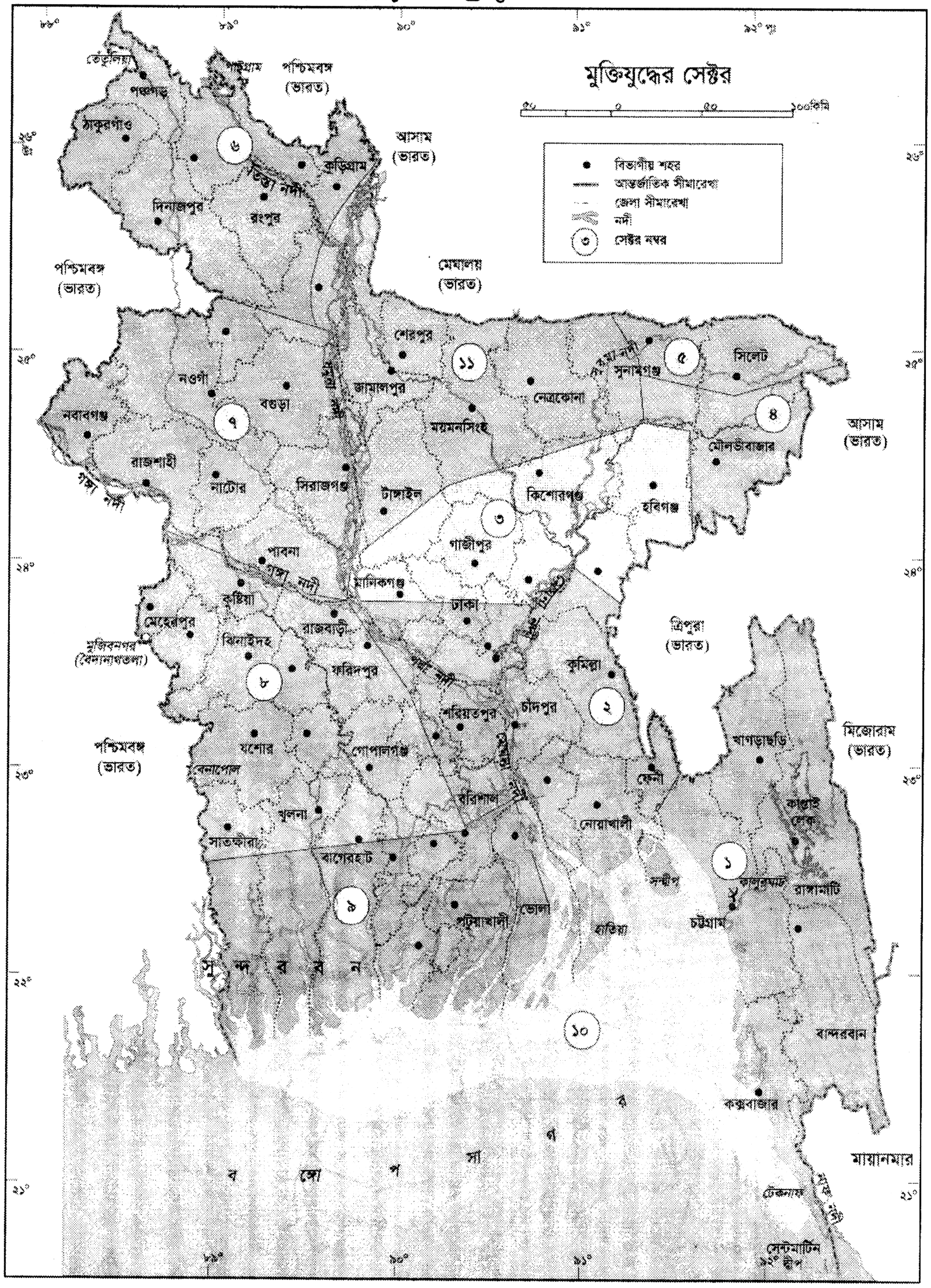

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

৮	কুষ্টিয়া - যশোর	আবু ওসমান চৌধুরী (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৭ জুলাই, ১৯৭১) এম. এ. মঞ্জুর (১৪ আগস্ট, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৯	বরিশাল - পটুয়াখালী জেলা ও খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ	এম.এ. জলিল (১৭ জুলাই, ১৯৭১ - ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১) এম.এ. মঞ্জুর, জয়নাল আবেদীন
১০	বঙ্গোপসাগর অঞ্চল	বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্ণেল ওসমানী ও ভারতীয় কমান্ডার এম.এন. সামন্ত -এর পরিচালনায় (৩-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
১১	ময়মনসিংহ - টাঙ্গাইল	জিয়াউর রহমান (২৭ জুন, ১৯৭১ - ১০ অক্টোবর, ১৯৭১) আবু তাহের (১০ অক্টোবর, ১৯৭১ - ২ নভেম্বর, ১৯৭১) এম. হামিদুল্লাহ খান (২ নভেম্বর, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)

Source: Banglapedia - War of Liberation and Wikipedia - List of sectors in Bangladesh Liberation War

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

১.১. বৈদিক যুগের শেষভাগে .... নামে বর্তমান বাংলাদেশের কিয়দংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.২: .... সালে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র।

১.৩: বাংলাদেশে বর্তমানে .... টি প্রশাসনিক বিভাগ আছে।

১.৪: বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হলো .... এবং বৃহত্তম একক হলো .... ।

১.৫: ১১ জন সেক্টর কমান্ডের .... মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ঠিক এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে অঠিক লিখুন:**

২.১: এদেশের দক্ষিণাংশের বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতলভূমির গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে।

২.২: কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার ফলে ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

২.৩: পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত প্রদেশ পশ্চিম বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা।

২.৪: বাংলাদেশের অবস্থান ২০°৩৪' উত্তর থেকে ২৮°৩৬' উত্তর অক্ষাংশ।

২.৫: অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বহির্গমন করে।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একটি বিবরণ দিন।

২. বাংলাদেশের সীমানা ও পারিসরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৩. প্রাচীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলোর বিবরণ লিখুন।

অথবা

ব্রিটিশদের এদেশে আগমনের পূর্বে বর্তমানের বাংলাদেশের ভূ-ভাগসমূহের বিবরণ দিন।

৪. পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার উপর ব্রিটিশদের ক্ষমতা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানের বাংলাদেশের প্রাথমিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ থেকে যায়। ব্যাখ্যা করুন।

৫. বাংলাদেশে ভূ-রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয় সম্পর্কে যাহা জানেন লিখুন।

২. কি কি কারণে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয় বা বিকাশ লাভ ঘটে তা আলোচনা করুন।

পাঠ-১.২

বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান
(Topography of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ভূ-সংস্থান ও ভূ-প্রকৃতি , এবং
- বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানগত শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থান বা অঞ্চলের নিয়ম সিদ্ধভাবে সঠিক বর্ণনা কে ভূ-সংস্থান (Topography) বলে। অর্থাৎ কোন স্থানের ভূমিরূপের বিভিন্ন বিষয়াদি, যেমন- জলবায়ু, নদ-নদী, অন্যান্য মানবীয় কর্মকান্ড ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এর অন্তর্ভূক্ত। অপর পক্ষে, ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনামূলক বিবরণকে ভূ-প্রকৃতি (Physiography) বলে। মূলতঃ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-সংস্থান সমার্থকবোধক। উত্তর আমেরিকায় ভূ-সংস্থান কথাটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত থাকলেও ভূ-প্রকৃতি শব্দটি বিশ্বের সকল স্থানে ব্যবহার হয়। তাই বর্তমান পাঠে ভূ-প্রকৃতি ও ভূ- সংস্থান সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপভূমি এবং বঙ্গ অববাহিকা নামে বহুল পরিচিত ভূতাত্ত্বিক গঠনগত এককের প্রধান অংশ সীমায় এর অবস্থান। এটি পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় (পশ্চিম বাংলা) ও উত্তরে শিলং মালভূমি (মেঘালয়) এবং পূর্বাংশে লুসাই ও আরাকান পাহাড়সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বঙ্গ অববাহিকার উদ্ভব টারশিয়ারী যুগে যার সঙ্গে হিমালয় পর্বত গঠন প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পৃক্ততা বিদ্যমান রয়েছে। একই সময়ে সৃষ্ট অপর এক ভূ-আলোড়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম ও নাগাপাহাড় গঠিত হয়েছে এবং চট্টগ্রাম ব্যতীত অবশিষ্ট বাংলাদেশ প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের নদীবাহিত পলল অবক্ষেপনের মাধ্যমে আজকের অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের অবয়ব/আয়তনগত দিক ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট ভূসংস্থানিক বৈচিত্র্য রয়েছে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, জরীপ ও শ্রেণীবিভাজন প্রক্রিয়ার অনন্য প্রয়াস। তাদের মধ্যে স্প্রেট (১৯৫৪), জনসন (১৯৫৭), ম্যাকিন্টার (১৯৫৯), এম আই চৌধুরী ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১), নাফিস আহমেদ (১৯৫৫), হারুন অর রশিদ (১৯৭৭) প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে নাফিস আহমেদ, হারুন অর রশিদ ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১) তাঁদের পুর্ববর্তী গবেষকগণের প্রদত্ত শ্রেণীবিভাজনের উপর ভিত্তি করে সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাজন উত্থাপন করেন। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ১৯৫৫ সালে নাফিস আহমেদ বাংলাদেশকে ভূপ্রাকৃতিক ভাবে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি এবং খ) পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের সীমান্তবর্তী পাহাড় সমূহ।
২. এম আই চৌধুরী ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ, খ) প্লেস্টোসিন যুগের উচ্চ ভূমি (চত্বর) এবং গ) সাম্প্রতিক কালের সমতল ভূমি।
৩. সাধারভাবে ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূরূপকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ ক) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়ী এলাকা, খ) প্লেস্টোসিন যুগের সোপান এলাকা গ) সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি এলাকা এবং ঘ) উপকূলীয় বদ্বীপ এলাকা।
৪. হারুন অর রশিদ (১৯৫৪, ১৯৭৭) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান ২৪ টি প্রধান ভাগ এবং তার সঙ্গে ৫৪ টি এককে বিভক্ত করেন।
৫. UNDP ও FAO সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে সর্বমোট ১৯ টি বিভাগে বিভক্ত করেন।

এই পাঠে হারুন অর রশিদ (১৯৫৪, ১৯৭৭) কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির প্রধান ২৪ টি ভাগ (ম্যাপ ১.২.১) সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিবরণ দেয়া হলো।

মানচিত্র ঃ ১.২.১ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ

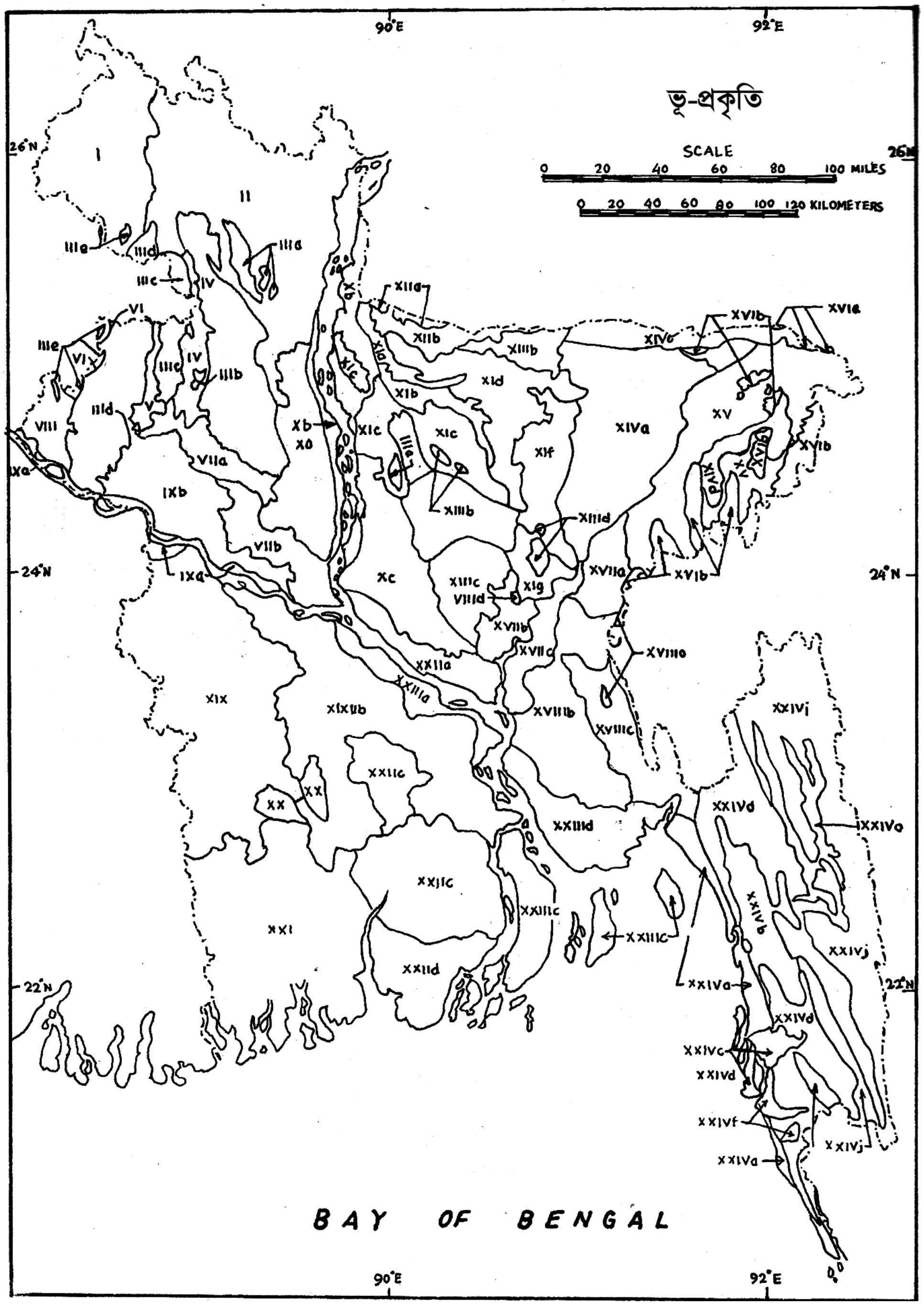

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১ (ভূ-প্রকৃতির রোমান হরফ এই মানচিত্রে ১, ২, ৩, ... হিসেবে দেয়া হলো)

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিবরণ (Physiographic sub-regions in Bangladesh)

হারুন-অর-রশিদ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী (physial features) ও পানি-নিষ্কাশন বিন্যাস ব্যবস্থার (Drainage pattern) ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মোট ২৪ টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন (ম্যাপ ১.১)। নিম্নে অঞ্চলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। যেমন ঃ

(১) হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি (Himalayan Piedmont Plains)

হিমালয় পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় অধিকাংশ স্থানব্যাপী এই ভূমিরূপ দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বত থেকে উদ্ভূত তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া, মহানন্দা,নাগর, টাঙ্গন ইত্যাদি নদী বাহিত পলল সঞ্চিত হয়ে পলল কোন ও পলল পাখা তৈরী করেছে। এই পলল কোন ও পলল পাখা জুড়ে গড়ে উঠেছে এদেশের প্রাচীনতম পলল সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি পশ্চিমে মহানন্দা থেকে পূর্বদিকে দিনাজপুরের করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে তেতুলিয়া (৯৭ মি. উচ্চ) থেকে দক্ষিনে দিনাজপুর (৩৪ মি. উচ্চ) পর্যন্ত এ অঞ্চলের ঢালের নতিমাত্রা প্রায় প্রতি কি. মি. ০.৯১ মিটার (Rashid,1991)। ফলশ্রুতিতে, এই অঞ্চলের নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলটির অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত (undulating) ঢাল বিশিষ্ট, যার সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় এ অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের কুলীক নদীর দুই তীর এলাকা বরাবর।

(২) তিস্তা প্লাবন সমভূমি (Tista Flood Plain) ঃ

দিনাজপুর জেলার করতোয়া নদীর উচু বেলে মাটির প্রাকৃতিক বাঁধ (natural levee) থেকে ব্রক্ষপুত্র নদ পর্যন্ত এই বিশাল প্রাকৃতিক অঞ্চলটি বিস্তৃত। এর একটি অংশ দক্ষিনে পুরাতন তিস্তা নদীর তীর বরাবর বর্ধিত হয়ে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝারী উচ্চতার শৈল শিরা (ridges) জাতীয় ভূমিরূপ ও অগভীর নদী উপত্যকা (shallow basin) বিশিষ্ট এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে। তবে ঘাঘট নদীর গতিপথে অবনমন (depression) রয়েছে যেখানে মাঝারী মাত্রার বন্যা হয়। তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী এই প্লাবন সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বালুচর (sandy bars) ও দিয়ারা (diara) সমৃদ্ধ এই নদীগুলোর সক্রিয় প্লাবনভূমি প্রায় ৬ কি. মি. চওড়া।

(৩) বরেন্দ্রভূমি (Barind Tract) ঃ বঙ্গ অববাহিকায় (bengal basin) অবস্থিত প্লায়োষ্টোসিন চত্বরসমূহের মধ্যে বরেন্দ্রভূমি উল্লেখযোগ্য। এই চত্বরের সমোন্নতি রেখা (contour lines) গুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় - এর দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি ৩৯.৭ মিটার উচ্চতায় এবং দ্বিতীয়টি ১৯.৮ থেকে ২২.৯ মিটার উচ্চতায়। বরেন্দ্র চত্বরটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা, লালচে ও হলদেটে কর্দম মৃত্তিকা, শাখা-প্রশাখা যুক্ত নদী নিষ্কাশন ব্যবস্থা (dendrite stream pattern), এবং উদ্ভিজ্জের স্বল্পতা। বরেন্দ্র চত্বরটি পাঁচটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত।

যেমন ঃ

ক. উত্তর-পূর্বাঞ্চল (North-eastern Outlier) ঃ

এই অঞ্চলের মাটি বরেন্দ্রভূমির অন্য অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা গাঢ়তর লালচে খয়েরী বর্ণের। এই অঞ্চলের 'আশুলা বিল' অঞ্চল এলাকা ব্যতীত বাকী অংশ বেশ উঁচু। এই অংশটির সীমানায় কোনো কোনো অংশ বেশ খাড়া, যা স্তূপ চ্যুতির (block faulting) প্রমান দেয়।

খ. পূর্ব বরেন্দ্রভূমি (Eastern Barind) ঃ

বরেন্দ্রভূমির পূর্বাংশ তারাস, সিঙ্গারা, নদীগ্রাম, রানীনগর, আদমদীঘি, কাহালু, শেরপুর, বগুড়া, শিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, সৈয়দপুর ও হাকিমপুর অঞ্চলের প্রায় ১৯৩০ কি. মি. জুড়ে বিস্তৃত। অল্প কিছু তরঙ্গায়িত (undualating) ভূমিরূপ ব্যতীত সমতল এই ভূমির উত্তর-পূবাংশের কিছু অংশ করতোয়া চ্যুতি (Karatoa Fault) দ্বারা অবশিষ্ট্যাঞ্চল থেকে বিভক্ত। এই অঞ্চলে ১৮১২ সালে এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের ফাটলগুলো তৈরী হয়েছিল বলে ধারনা করা হয় (Buchanan - Hamilton, 1833)।

গ. পূর্ব বরেন্দ্রভূমির মধ্যভাগ (East - Central Barind)

বরেন্দ্রভূমির এই অংশটির ৫০৭ বর্গ কি. মি. এলাকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। চিরির বন্দর উপজেলা থেকে মহাদেবপুর উপজেলা পর্যন্ত প্রায় ৯৭ কি. মি. দীর্ঘ এই ভূ-ভাগের পশ্চিমাংশ আত্রাই নদী উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে এই ভূ-ভাগটি অকস্মাৎ নীচু হয়ে ভর অববাহিকায় (Bhar basin) মিলিত হয়েছে। উত্তরে পার্বতিপুর ও চিরির বন্দরের মধ্যবর্তী এলাকাটি ৩৯ মি উঁচু। অল্প কিছু তরঙ্গায়িত (undualating) ভূমিরূপ, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট্য খাদ যুক্ত নদী নিষ্কাশন ব্যবস্থা (entrenched dendrite stream pattern) বিশিষ্ট্য এই অঞ্চলের মধ্যভাগ বরাবর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব মুখী ৩২ কি.মি. দীর্ঘ একটি চ্যুতি (Fault) রয়েছে।

ঘ. পশ্চিম বরেন্দ্রভূমির মধ্যভাগ (West- Central Barind) ঃ

বরেন্দ্রভূমির এই অংশটি ১৭৭০ বর্গ কি. মি. এলাকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রায় ১৪৫ কি. মি. দীর্ঘ এই ভূ-ভাগ গড়ে ১৬ কি. মি. থেকে ৩৭ কি. মি. প্রশস্ত। উত্তরে এই অঞ্চলটি দিনাজপুরের দক্ষিণে হিমালয় পাদদেশীয় পলল সমভূমি পর্যন্ত ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। দক্ষিণে গঙ্গা নদীর সু-উচ্চ খাড়া পাড় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রায় সমতল হলেও বাকী অংশ তরঙ্গায়িত ভূমিরূপ বিশিষ্ট্য। অসংখ্য খাঁড়ি (Gullies) দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটি বিভক্ত হয়ে আছে।

পুরোনো পলিসঞ্চিত এই চত্বরভূমি কোনো কোনো অংশে সামান্য ঢিবির ন্যায় (Dome-shaped) উঁচু হয়ে গড়ে।

ঙ. পশ্চিম বরেন্দ্রভূমি (Western Barind) ঃ
বাংলাদেশের গোমস্তাপুর ও পোরশা উপজেলায় চারটি ছোট ছোট অংশের সমন্বয়ে (প্রায় ৮১ বর্গ কি. মি.) গঠিত এই অঞ্চল পূণর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর ঘেষে অবস্থিত।

(৪) ছোট যমুনা প্লাবনভূমি (Little Jamuna Flood Plain)
ছোট যমুনা নদী অববাহিকা দিনাজপুরে সংকীর্ণ হলেও দক্ষিণে এর প্রশস্ততা ৮ থেকে ১৬ কি. মি.। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই প্লাবনভূমির আয়তন ৫৩১ বর্গ কি. মি.। এই অঞ্চলের ৩ থেকে ৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ধুসর বেলে মাটির স্তর পরিলক্ষিত হয়।

(৫) মধ্য আত্রাই প্লাবনভূমি (Middle Atrai Flood Plain) ঃ
চিরির বন্দর উপজেলা, থেকে মহাদেবপুর পর্যন্ত ৮১ কি. মি. দীর্ঘ এই নদী উপত্যকাটির দু'পাশেই বরেন্দ্রভূমির উপস্থিতি দেখা যায়। অগভীর উপত্যকায় আকস্মিক বন্যা হলেও কিছু কিছু অংশে উঁচু ভূমিরূপ গুলো বন্যা মুক্ত উচ্চতায় রয়েছে। প্লাবনভূমিটির আকস্মিক বন্যা বাহিত বেলে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত। আত্রাই নদী কোনো কোনো অংশে সর্পিলকার ও সুগভীর বাঁক বিশিষ্ট।

(৬) নিম্ন পূর্ণভবা প্লাবন সমভূমি (Lower Punarbhoba Flood Plain) ঃ
এই প্লাবন সমভূমি কেন্দ্রীয় বরেন্দ্র অঞ্চল ও পশ্চিম বরেন্দ্র অঞ্চল কে পৃথক করেছে। এই অঞ্চলটি ভারতের দিনাজপুর জেলার ২৬ কি. মি. দক্ষিণ থেকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর রোহনপুর) উপজেলায় মহানন্দা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরো সমভূমিটি ৮১ কি. মি. লম্বা ও ৩ থেকে ৮ কি.মি. চওড়া একটি নদী উপত্যাকা (Valley) অঞ্চল (region)। এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ক্রুটিপূর্ণ হওয়ায় জমির উর্বরতা কম।

(৭) নিম্ন আত্রাই (ভর) উপত্যকা (Lower Atrai (Bhar) Basin) ঃ
বরেন্দ্রভূমি ও গাঙ্গের সমভূমির মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত এই অববাহিকাটি মূলতঃ একটি নীচু অঞ্চল (Depression), যা চলন বিল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটিতে বরেন্দ্র এলাকা থেকে আগত পানি সঞ্চিত হয়। প্রায় জুন-থেকে অক্টোবর পয্ন্ত বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৩১২০ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই চলন বিল প্রায় ০.৬১ মি. থেকে ৩.৭ মিটার গভীর পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমেও এই এলাকা আর্দ্র থাকে।

(৮) নিম্ন মহানন্দা প্লাবনভূমি (Lower Mahananda Flood Plain) ঃ
দিনাজপুর জেলার হিমালয় পাদদেশীয় প্লাবন সমভূমির অব্যবহিত পর থেকে নিম্ন মহানন্দা প্লাবনভূমি দক্ষিনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। মহানন্দা নদীর পশ্চিমে ৮ - ১১ কি. মি. এবং পূর্বে ১.৬০ - ৫ কি. মি. প্রশস্ত। বরেন্দ্রভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যবর্তী এই উপত্যকাটির আয়তন ৪০২ বর্গ কি. মি. নদীটি সর্পিল ও অগভীর নদী বাঁক বিশিষ্ট।

(৯) গঙ্গা নদীর প্লাবন সমভূমি (Ganges River Flood Plain) ঃ
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা অথবা পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ কি. মি.। অসংখ্য শাখা নদী ও উপনদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে এই নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ৩১০০ কি. মি.। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে রাজেশ্বরপুরে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে গঙ্গা বা পদ্মার প্লাবনসমভূমি বিস্তৃত। এই প্লাবন সমভূমির প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো উত্তরাংশে নদীর তীরের উচু প্রাকৃতিক বাঁধ প্রাকৃতিক এবং দক্ষিনাংশে অগভীর জলাভূমি, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও চর সমূহ। গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই ধরনের হ্রদ বা বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

(১০) ব্রক্ষপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি (Brahmaputra - Jamuna Flood plain) ঃ
ব্রক্ষপুত্র -যমুনা নদীর দ্বারা সৃষ্ট এই প্লাবনভূমি তিনটি উপ-অঞ্চল নিয়ে গঠিত। অঞ্চলগুলো হলো-(i)বাঙ্গালী-করতোয়া নদী বিধৌত প্লাবনভূমি, (ii) দিয়ারা ও চর ভূমি ও (iii) যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমি। ১৭৮৭ সালে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী গতি পরিবর্তন করে বর্তমান গতিপথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে এবং জেনাই ও কোনাই নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী চরোৎপাদী সুপ্রশস্ত যমুনা নদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পুরাতন ব্রক্ষপুত্রের গতি পরিবর্তন করবার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানী ও ভৌগলিকগণ বিভিন্ন মতামত দেন। তন্মধ্যে মর্গান ও ম্যাকিনটার (১৯৫৯) প্রদত্ত মতামত সর্বপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। তাঁদের মতে, বরেন্দ্রভূমি চত্বর এলাকা (৩ নং ভূ-প্রাকৃতিক এলাকা দ্রষ্টব্য) ও মধুপুরের গড় এলাকার (১৩ নং ভূ-প্রাকৃতিক এলাকা দ্রষ্টব্য) মধ্যবর্তী স্থানটি অবনমিত হয়ে স্রংস/স্রস্ত উপত্যকা (Rift valley) সৃষ্টি করে (হক, ১৯৮৮)। এই অবনমিত গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে বর্তমান ব্রক্ষপুত্র-যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রক্ষপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি অঞ্চলটির তিনটি উপ-অঞ্চল সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

(i) **বাঙ্গালী-করতোয়া নদী বিধৌত প্লাবনভূমিঃ** পুরো প্লাবনভূমি জুড়ে ভারি পলি ও কর্দমেয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চওড়া উচ্চভূমি/উত্থিতভূমি (broad ridges) ও উপত্যকা সমূহ, মধ্য জুন থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে ০.৯১ মিটার গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের উত্থিতভূমি গুলো পলিসমৃদ্ধ হলেও অববাহিকা অঞ্চল কর্দমময়।

(ii) **দিয়ারা ও চর ভূমিঃ** ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে অসংখ্য দিয়ারা ও চর। সর্ববৃহৎ দিয়ারা গুলো রাহুমারী উপজিলায় মেঘালয় মালভূমির পশ্চিম পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে প্রচুর সক্রিয় চর রয়েছে। মৃত্তিকা ও ভূ-সংস্থানিক বৈচিত্রপূর্ণ এ সমস্ত দিয়ারা ও চর সমূহের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উচ্চতার ব্যবধান ৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(iii) **যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমিঃ** ব্রহ্মপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমির বাম পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমি নামে অভিহিত। এই অঞ্চলটির দক্ষিণনাংশ এক সময় গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্ষা মৌসুমে এই উপভাগের অধিকাংশ অঞ্চল ০.৯১ মিটার গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে।

(১১) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমি (Old Brahmaputra Flood Plain) ঃ

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীটি গতি হারালে পলল সঞ্চিত হয়ে মাত্র ২ কি. মি. চওড়া একটি প্রণালী (Channel) এ পরিনত হয়। এই প্রণালীটির দু'ধারে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে আসা প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural levee) রয়েছে। এই প্রাকৃতিক বাঁধ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। উত্থিতভূমি (high ridges), প্লাবন ভূমি, সক্রিয় ব-দ্বীপ এলাকা, গভীর ও অগভীর নদী অববাহিকা, ছোট ছোট নদী বা প্রণালী, তরঙ্গায়িত ভূমি, ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

(১২) সুসং পাহাড় ও পাদদেশীয় পলিজ সমভূমি (Susang Hills and Piedmont) ঃ

(i) **সুসং পাহাড়ঃ** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জামালপুর থেকে সুনামগঞ্জ জেলা পর্যন্ত প্রায় ১৬১ কি.মি দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে সুসং পাহাড়ী (টিলা) ভূমিরূপ রয়েছে। মেঘালয় মালভূমির পাদদেশস্থ টিলা সমূহ এই অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত। বেলে পাথর, চূনাপাথর, সাদা কর্দম (White clay), শেল, এই অঞ্চলের প্রধান গাঠনিক শিলা। এ অঞ্চলের টিলাগুলোর সর্বোচ্চ উচ্চতা ৯২ মিটার ও উপত্যকার উচ্চতা ৩১ মিটারের উর্ধ্বে। অসংখ্য গভীর খাদ বিশিষ্ট্য (entrenched) পাহাড়ী নদী বাহিত বালু ও পলি সঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে নীচু জলাবদ্ধ ভূ-ভাগ। এই অঞ্চলের পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয়া মালভূমির পাদদেশে রয়েছে ৬১০ কি. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট বেশ কতগুলো বৃহদাকার ফাটল (gigantic fault)।এই ফাটল গুলোর পাদদেশে রয়েছে নীচু হাওর অববাহিকা।

(ii) **পাদদেশীয় পলিজ সমভূমিঃ** সুসং পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশীয় ভূমি (নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, কমলাকান্দা ও দূর্গাপুর উপজেলার কিয়দাংশ) সুষম ঢাল (gentle slope) বিশিষ্ট। দক্ষিণে সারি সারি নদী পর্যঙ্ক গুলো বর্ষা মৌসুমে স্বল্পমাত্রায় প্লাবিত হয়। তবে আকস্মিক বন্যা গোটা অঞ্চলকে মাঝে মাঝে প্লাবিত করে।

(১৩) মধুপুর গড় অঞ্চল (Madhupur Tract) ঃ

বরেন্দ্রভূমির ন্যায় এই অঞ্চলটি বঙ্গ অববাহিকা (Bengal Basin) -এর অভ্যন্তরে আরেকটি প্লাইস্টোসিক কালের সোপান। প্রায় ২,৫৫৮ বর্গ কি. মি. (Rashid, 1991) বিশিষ্ট এই গড় অঞ্চলের বিস্তৃতি দক্ষিণে ঢাকার উত্তরাংশ থেকে উত্তরে জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলা পর্যন্ত। মধুপুর গড়ের ভিত্তি মধুপুর কর্দমের উপরে হলেও উপরিভাগে রয়েছে পুরাতন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত পলল মৃত্তিকা। মধুপুর গড় মূলতঃ ভূ-গাঠনিক আন্দোলনের (Tectonic Movement) ফলে সৃষ্টি উত্থিত চ্যুতিস্তূপ (Fault Block) জাতীয় ভূমিরূপ। পুরো এলাকা জুড়ে গভীর খাদ বিশিষ্ট সর্পিলকার (Meandering) ও বৃক্ষসদৃশ (Dendritic) নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে। এর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু। মধুপুর অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মালভূমি সদৃশ ঢাল বিশিষ্ট উঁচু ভূমি (Chala) যেগুলোর উচ্চতা ৯ থেকে ১৮ মিটার, কালো রং এর পলল সমৃদ্ধ অববাহিকা (Baid/বাইদ) বিচুর্নীভূত (weathered) সমতল ভূমি, ছোট বড় আকারের বিক্ষিপ্ত চ্যুতি স্তূপ (blocks), মৃদু তরঙ্গায়িত (undualating) ঢাল ইত্যাদি ভূমিরূপ। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে ৬ থেকে ১৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট্য চ্যুতি (Fault)।

(১৪) সিলেট হাওর অববাহিকা (Sylhet Haor Basin) ঃ

সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবনভূমি, বৃহত্তর সিলেট জেলা এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বাংশ জুড়ে সিলেট বেসিন বা হাওর অববাহিকা অবস্থিত। প্রায় ৪৫০৫ বর্গ কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট এই অববাহিকাটি সুরমা-কুশিয়ারা নদীর প্লাবনভূমির পশ্চিমাংশ। সমগ্র অঞ্চলটি মধুপুর গড় উত্থিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সিলেট অববাহিকায় সুরমা-কুশিয়ারা নদী বাহিত প্রচুর পলি সঞ্চিত হলেও অববাহিকাটির অবনমন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় হাওর বা বিল গুলো ভরাট হতে পারে না। গত কয়েক শত বছরে সিলেট অববাহিকা ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত অবনমিত হয়েছে (মর্গান ও ম্যাকিনটার, ১৯৫৯)। সিলেট অববাহিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো, দক্ষিনাংশের বিল (Bils) বা হাওর (Haor) সমূহ, নদী বিচ্ছেদ (cut off), বারি আর্বত গহ্বর (Scours), প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural levee), ইত্যাদি। হালকা ধূসর (Light Great) ও পঙ্ক-পলিযুক্ত কর্দম (Silty Clay) এই অঞ্চলের প্রধান মৃত্তিকা।

(১৫) সিলেট উচ্চভূমি (Sylhet High Plains) ঃ

সিলেটের হাওর অববাহিকার নীচু উপত্যকা সমূহের মাঝে সিলেট উচ্চভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের উচ্চতা ৯ মিটার। ক্ষুদ্র নদী প্রবাহগুলো (Streams) বেশ গভীর খাদ যুক্ত। এই উচ্চভূমিতে কয়েকটি হাওর ও বিল

রয়েছে, তবে এগুলো সিলেট হাওর অববাহিকার হাওর ও বিলগুলো অপেক্ষা অধিকতর উঁচুতে অবস্থিত। শীত মৌসুমের প্রারম্ভে এই হাওর ও বিলগুলো শুষ্ক হয়ে পড়ে।

(১৬) সিলেট পাহাড়সমূহ (Sylhet Hills) ঃ
সিলেট জেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর মেঘালয়া মালভূমির (Meghalaya Plateau) পাদদেশে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত কতিপয় ছোট আকারের পাহাড় (Foot Hills) পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়গুলোর দক্ষিণ পূর্বাংশে রয়েছে ছাতক টিলা বা ছোট পাহাড়সমূহ যা মূলতঃ উত্তরের সিলেট পাহাড়ের বর্ধিতাংশ। সিলেট জেলায় প্রায় ১৮৬.৪৮ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই ছোট পাহাড়গুলোর উচ্চতা ৬১ মিটার থেকে ৯১ মিটার (চৌধুরী, ১৯৯৫)। এই সকল পাহাড়ের উপরিভাগ, গভীর খাদ যুক্ত স্রোতধারার (entrenched streams) দ্বারা ক্ষত বিক্ষত। পাহাড়গুলোর গাঠনিক উপাদান টারশিয়ারী যুগের বেলে পাথর, চুনাপাথর, কর্দম পাথর ইত্যাদি হলেও এর উপরিভাগ প্লায়োস্টোসিন কালের পলল দ্বারা আবৃত। পাহাড়গুলোয় সিলেট পাহাড় ও ছাতকের টিলা সমূহ ব্যতীত সিলেট জেলার দক্ষিনাংশে ছয়টি পাহাড় শ্রেনী (Hill Ranges) (Rashid,1991))। সিলেট জেলার পূর্ব সীমানায় প্রায় ৪০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত এই পাহাড় শ্রেনী চট্টগ্রাম পাহাড় শ্রেনীর বর্ধিতাংশ। এই পাহাড়শ্রেনীর উচ্চতা গড়ে ১৮৩ মিটার হলেও সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২০৮ মিটার (কুলেরাল টিলা) (Rashid,1991)

(১৭) মেঘনা প্লাবনভূমি (Meghna Flood Plain) ঃ
মেঘনা প্লাবনভূমি সুরমা-সুশিয়ারা নদীর সঙ্গমস্থল (meeting point) থেকে দক্ষিনে চাঁদপুর জেলার পূর্বাংশে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে রয়েছে মেঘনার শাখানদী (distributary) তিতাস নদী বিধৌত প্লাবনভূমি, লক্ষ্যা-বংশাই দোয়াব (Doab) অঞ্চলের অংশ বিশেষ এবং মধ্য মেঘনা প্লাবনভূমি। অসংখ্য বাঁকের চর (Point Bar), নীচু উর্বর সমতল প্লাবন ভূমি (Low fertile floodplain), লম্বাটে আকৃতির চর (elongated char), দিয়ারা (Diara), ইত্যাদি। মেঘনা প্লাবনভূমির প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী। মেঘনা নদী ও এর উপনদী বাহিত বিপুল পরিমান বৃহদাকার দানা মুক্ত পলি নদীর প্রাকৃতিক বাঁধের (natural levee) পশ্চাৎ দিকে (Back Slope) সঞ্চিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত মিহি দানাদার পঙ্কপলি (Silt) ক্রমশঃ নদীর পাড় থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। মেঘনা নদীর ক্ষয়কার্যের (erosional astivity) তীব্রতা অধিক নয়। মেঘনা নদীর নিম্ন গতিতে (**lower course**) চরসমূহ আকস্মিক ভাবে পরিবর্তন প্রবন (Sudden change) হলেও উর্ধ্বগতিতে চরসমূহ বেশ স্থিতিশীল।

(১৮) ত্রিপুরা সমতল (Tippera Surface) ঃ
ত্রিপুরা পর্বতের পাদদেশে বাংলাদেশে কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ, নোয়াখালী ও সিলেট জেলার কতকাংশ জুড়ে এই সমতল ভূমি অবস্থিত। আয়তক্ষেত্রাকার নদী ব্যবস্থা (Rectangular pattern drainage pattern) বিশিষ্ট এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অন্যান্য প্লাবনভূমির মৃত্তিকা অপেক্ষা অধকতর জারিত (Oxidised)। তিনটি উপবিভাগ বিশিষ্ট এই ভূ-ভাগ বেশ বৈচিত্রপূর্ণ।

(i) **পূর্ব পাদদেশীয় ভূ-ভাগ ও লালমাই পাহাড় শ্রেনী (Eastern Piedmont Strip & Lalmai** Range) ঃ ত্রিপুরা পর্বত পাদদেশীয় এই অঞ্চল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২ থেকে ১৫ কি. মি. পর্যন্ত চওড়া, প্লাইয়োষ্টোসিন পলল নির্মিত পর্বত বিধৌত বালুকাময় কর্দম আচ্ছাদিত এই ভূ-ভাগটি প্লাইয়োষ্টোসিন চত্বরের অন্তর্ভূক্ত। কুমিল্লা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত ১৫ কি. মি. দীর্ঘ ও প্রায় ১.৫ কি.মি. চওড়া লালমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪৬ মিটার। এটি গঠনগত দিক থেকে একটি গ্রস্থ মালভূমি (Horst)।

(ii) **নীচু প্লাবনভূমি (Low floodplain)** ঃ দক্ষিণ নবীনগর থেকে মাইজদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ নীচু প্লাবনভূমি প্রায় সমতল ও চওড়া উত্থিত ভূমি (ridges) ও অববাহিকা (basins) বিশিষ্ট এই ভূ-ভাগ বর্ষা মৌসুমে মেঘনা-গুমতি-ডাকাতিয়া নদীর পানি দ্বারা প্লাবিত হয়।

(iii) **বিচ্ছিন্ন উঁচু প্লাবনভূমি (High Floodplain)** ঃ স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়ে ডাকাতিয়া, ছোট ফেনী ও গুমতী নদীর তীর অঞ্চল বিচ্ছিন্ন ভাবে সংকীর্ণ উত্থিত ভূমি ও অববাহিকা বিশিষ্ট হলেও বাকী অঞ্চলে প্রশ্বস্ত উত্থিত ভূমি ও অববাহিকা পরিলক্ষিত হয়। লালমাই পাহাড় শ্রেনী ও ত্রিপুরা পাহাড় -এর মধ্যবর্তী কুমিল্লা উপত্যকাটি (Comilla Basin) -একটি গ্রস্থ উপত্যকা মনে করা হয়।

(১৯) মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চল (Moribund Delta) ঃ
বৃহত্তর কুষ্টিয়ার কিয়দংশ ও খুলনা জেলার উত্তরাংশ জুড়ে বিস্তৃত অংশটি গঙ্গা নদী ও এর শাখা নদী বিধৌত ব-দ্বীপ ভূমি। এই অঞ্চলের নদীগুলো বালু সঞ্চিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। গঙ্গা নদীতে ভারী বন্যা (high flood) সংঘটিত হলে কেবলমাত্র কিছু পরিমান পানি নদী গুলো দ্বারা প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলের নদীগুলো সর্পিলাকার (meandering), বহু সংখ্যক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Oxbow Lake), নীচু দোয়াব অঞ্চল (Interfluve depression) এবং উচ্চ প্লাবনভূমি (High Floodplain) এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। সমস্ত অঞ্চলটি বালুময় মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা বাকী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ।

(২০) কেন্দ্রীয় ব-দ্বীপ অববাহিকা/পর্যঙ্ক (Central Delta Basin) ঃ

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যভাগে ফরিদপুর-বরিশাল এলাকায় অবস্থিত বিস্তৃত অগভীর এক সারির অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি (basin or depression) রয়েছে। এই গুলো স্থানীয়ভাবে 'ঝিল' নামে পরিচিত (চৌধুরী, ১৯৮৮)। তবে ১৯৩১ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি 'ফরিদপুর বিল এলাকা' (Faridpur Bill Area) হিসেবেও সুপরিচিত ((Rashid,1991))। এই অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি সমূহ ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার (tectonic processes) ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারনা করা হয় (মর্গান ও ম্যাকিনটার, ১৯৫৯)।

(২১) অপরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল (Immature Delta) ঃ

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিনে প্রায় সমুদ্র সমতলের সমান উচ্চ চওড়া ভূ-ভাগকে অপরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত সুন্দরবন বনাঞ্চল ও কৃষিভূমিসহ প্রায় ৪৮২৭ কি. মি. এলাকা জুড়ে অপরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল বিস্তৃত ((Rashid,1991))। স্রোতজ সমভূমি (Tidal Plain) বা উপকূলীয় লবনাক্ত সমভূমি (Coastal Saline Plain) নামে অভিহিত এই অঞ্চলের ভূমির বেশ কিছু সংখ্যক নদীমালা দ্বারা অবক্ষেপিত পলি সঞ্চিত হয়ে তৈরী হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৮৮)। পর্যাপ্ত পলি সঞ্চয়নের অভাব (absence of adequate deposition) ও ভূমির অবনমনের (subsidence) ফলে এই অপরিনত ব-দ্বীপ (Immature delta) অঞ্চল গঠিত হয়েছে বলে ধারনা করা হয় (রশীদ, ১৯৮৮)। নীচু পাড় বিশিষ্ট অগভীর নদীমালা, বালিয়াড়ির সারি (Sand dune ridges) কর্দম সমতল (mud flat), খাঁড়ি ও বিস্তীর্ণ মগ্নচড়া (extensive shoals) ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী।

(২২) পরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল (Mature Delta) ঃ

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ ও স্রোতজ ব-দ্বীপ ভূমির মধ্যভাগে পরিণত ব-দ্বীপ ভূমি অবস্থিত। কপোতাক্ষ ভদ্রা-ভৈরব ইত্যাদি নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলে পুরাতন গঙ্গা প্লাবনভূমির (old Ganges flood plain)। কিছু এলাকা পদ্মা-মধুমতি প্লাবনভূমি, অলবনাক্ত স্রোতজ প্লাবনভূমি (mon-saline tidal flood plain) ও লবনাক্তা স্রোতজ প্লাবনভূমির (saline tidal flood plain) সমন্বয়ে এই অঞ্চল গঠিত। আড়িয়াল বিল, উত্তর-পশ্চিমের অগভীর ভাবে প্লাবিত ভূমি, দক্ষিন-পশ্চিমাংশের গভীরভাবে প্লাবিত অববাহিকা, নদী তীরের প্রাকৃতিক বাঁধ (natural levees), ও বড় নদীর মধ্যবর্তী স্থানে আড়াআড়ি স্রোতধারা (cross-channel) ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-পাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

(২৩) সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল (Active Delta) ঃ

পদ্মা নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত চর ও দিয়ারা সমূহ, নিম্ন মেঘনায় মেহেন্দীগঞ্জ দ্বীপ বা চর এবং মেঘনা মোহনাস্থ তিনটি খাঁড়ি, যেমন : হরিনঘাটা, আগুনমুখা ও মেঘনায় সৃষ্ট বালুচর (sand bars) এবং অগনিত চর নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের চরগুলোকে এখনও সৃষ্টি ও ভাঙ্গন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আরও দক্ষিনে রয়েছে ভোলা, রামগতি, হাতিয়া ও সন্দ্বীপ-এর ন্যায় বৃহদাকার দ্বীপসমূহ। তেঁতুলিয়া নদী, শাহবাজপুর নদী, হাতিয়া প্রনালী (Channel) ইত্যাদি এ অঞ্চলের প্রধান স্রোতধারা। বৃহদাকার মগ্নচড়া (shoals) ও মেঘনা ও বড় ফেনী নদী বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে মেঘনা মোহনাস্থ সমতলভূমির আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২৪) চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল (Chittagong sub-region) ঃ

চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলটি ফেনী নদীর দক্ষিনে অবস্থিত নানা ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক বৃহৎ ভৌগোলিক উপ-অঞ্চল। তরঙ্গায়িত পর্বতমালা, উপত্যকা, ঝরণা, খাল, দ্বীপ ও সন বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলকে একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। ফেনী নদীর তীর থেকে মাতামুহুরী ব-দ্বীপ পর্যন্ত এক থেকে পনের ফুট চওড়া ও ১২১ কি. মি. দীর্ঘ সমুদ্রতীর, সীতাকুন্ড, জলদি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী লম্বাকৃতির উপত্যকা, চকোরিয়া সুন্দরবন, মাতামুহরী নদীর বদ্বীপ, মহেশখালী দ্বীপ ও প্রনালী, সোনাদিয়া দ্বীপের কর্দম ভূমি (mudflat), কুতুবদিয়া ইত্যাদি চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম।

পাহাড়ী এলাকার মধ্যে পশ্চিমের সীতাকুন্ড পাহাড় (৩৫২ মি. সর্বোচ্চ শৃঙ্গ), চিম্বুক পাহাড়, টেকনাফ পাহাড় এবং পূর্বের রাম পাহাড় (৪৩৬ মি.), বরকল পাহাড় (৫৭২ মি), পাহাড় মধ্যবর্তী উপত্যকা এবং ঝরনাসমূ চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান পার্বত্য ভূমিরূপ।

এছাড়া কর্ণফুলী নদী, কাসালং নদী, কাপ্তাই লেক (৬৪৪ বর্গ কি. মি.) বাঁকখালী নদী ও উপত্যকা, নাফ নদী ও টেকনাফ সমভূমি, দক্ষিনের বেলাভূমি, ভৃগু (cliff), চূনাপাথর ও প্রবাল নির্মিত ক্ষুদ্র দ্বীপ (islet) সেন্ট মার্টিন এবং জিনজিরা প্রবাল প্রাচীর (coral reef) টেকনাফ উপদ্বীপের (peninsula) প্রায় সাত কি. মি. দক্ষিন-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন এবং অঠিক উত্তরের পাশে × চিহ্ন দিনঃ**

১.১. সাধারণভাবে ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূরূপকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১.২. মূলতঃ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-সংস্থান সমার্থক বোধক।

১.৩. বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপভূমি এবং বঙ্গ অববাহিকা নামে বহুল পরিচিত।

১.৪. চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত অবশিষ্ট্য বাংলাদেশ প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের বহু সংখ্যক নদীবাহিত পলল অবক্ষেপনের ফলে গড়ে উঠেছে।

১.৫. নিম্ন আত্রাই অববাহিকা অঞ্চলই চলন বিল নামে পরিচিত।

১.৬. হিমালয়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমি প্রাচীনতম পলল সমভূমি অঞ্চল।

১.৭. ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্লাবন সমভূমি নিয়ে আড়িয়াল বিল গঠিত হয়েছে।

১.৮. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপ, স্টেন্টমার্টিন।

১.৯. সেন্টমার্টিন মূলতঃ একটি প্রবাল দ্বীপ।

১.১০.গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের অংশ বিশেষ নিয়ে মধুপুর ট্রাক্ট।

২. **শূন্যস্থান পুরণ করুন ঃ**

২.১. তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী .... প্লাবন সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

২.২. হারুন অর রশিদ ...., ... বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান .... প্রধান ভাগ, সঙ্গে .... এককে বিভক্ত করেন।

২.৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ের পার্শ্বদিয়ে সাঙ্গু , ... ইত্যাদি নদী প্রবাহিত হয়ে মঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

২.৪. দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে দেখা যায় প্লেস্টোসিন যুগের .... ভূমি যা সামান্য .... অপেক্ষাকৃত .... সমভূমি।

২.৫. খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় রয়েছে .... নামক বনভূমি, যা মূলতঃ .... বনভূমির অর্ন্তভূক্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. প্লেস্টোসিন যুগের চত্বরসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. ব্রক্ষপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. গঙ্গা নদী প্লাবন সমভূমিসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

৫. ত্রিপুরা সমতলভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানগত শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২. হারুন-অর-রশিদ প্রদত্ত বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পরিণত, অপরিণত ও মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনা দিন।

পাঠ-১.৩

বাংলাদেশের জলবায়ু
(Climate of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনারা জানতে পারবেন-

- জলবায়ু ও এর উপাদানসমূহ
- বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণী বিভাজন
- বাংলাদেশের জলবায়ুর অঞ্চলসমূহ এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh)ঃ

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। কর্কট ক্রান্তি রেখা (২৩½° উঃ) বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করায় এদেশে ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, শুষ্ক-শীতল শীতকাল এবং বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ষড়ঋতুর এই দেশের প্রতি ঋতু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এদেশের জলবায়ু, তথা প্রতিটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের তারতম্য, আর্দ্রতা, ও ঝড়-ঝঞ্চা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন অঞ্চলের জলবায়ু বা তার যে কোন উপাদান একক বা সম্মিলিতভাবে সে অঞ্চলের জীবজন্তু, উদ্ভিদ, মানুষ, ইত্যাদির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

জলবায়ু (Climate) ঃ

কোনো একটি বৃহৎ স্থান বা অঞ্চলের বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাত ইত্যাদি উপাদানগুলোর দীর্ঘ দিনের (২০ বা ৩০ বছরের) গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়।

জলবায়ুর উপাদান (elements) ও নিয়ন্ত্রক (controls) সমূহ ঃ

জলবায়ুর উপাদান বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলের তাপমাত্রা (tamparatere), বায়ুচাপ (pressure), বায়ু প্রবাহ (winds) আর্দ্রতা (humidity) এবং বারিপাত (precipitation) ইত্যাদি বোঝায়।

অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কতগুলো নিয়ন্ত্রকের দ্বারা। এই নিয়ন্ত্রক গুলো (controls) হলো, অক্ষাংশ বা অক্ষরেখা (latitude), উচ্চতা (altitude), সমুদ্র স্রোত (ocean currents) ভূমি বন্ধুরতা (relief), বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ (storms cyclones), স্থল ও জলভাগের অবস্থান (position relative to continents), ইত্যাদি।

এই নিয়ন্ত্রকগুলো (controls) আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলোর পারিসরিক বা স্থানিক (spatial) ও সময়গত (temporal) বিস্তরন নির্ধারণ করে মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু অঞ্চলের সৃষ্টি করে।

জলবায়ুর উপাদানসমূহ (Climatic Elements) ঃ

কোন একটি বৃহৎ অঞ্চলের জলবায়ুর উপাদানসমূহ একক অথবা সম্মিলিতভাবে সে অঞ্চলের নানা প্রজাতির জীব ও উদ্ভিদ, বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকা, এবং সেই অঞ্চলে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় এক ব্যাপক ও শক্তিশালী ভূমিকা রেখে থাকে। অতএব, যে কোন একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে হলে, ঐ অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিম্নে বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদান সমূহ (elements) সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো।

ক. তাপমাত্রা (Temparature)ঃ

জলবায়ুর উপাদান হিসেবে তাপমাত্রা হলো, একটি স্থানের প্রকৃত তাপমাত্রা ও সেই স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের ফলে অনুভূত উষ্ণতা বা শীতলতার (heat or cold) পরিমাণ বা ডিগ্রী (Arora, 1995)।

বাংলাদেশের তাপমাত্রা ক্রান্তীয় থেকে উপক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (mean annual temperature) হচ্ছে ২৫° সে. এবং গ্রীষ্ম কালে গড় তাপমাত্রা ৩০.৪° সে. (কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম) থেকে ৩৬° সে. (রাজশাহী) পর্যন্ত পৌঁছে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও মৃতপ্রায় বদ্বীপ (Moribund) অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন শুষ্ক ও উষ্ণ পশ্চিমা (paschi) বায়ুপ্রবাহিত হয় (Rashid,1991)। কখনও কখনও বজ্রঝড় (Thunder storm) হয়। অন্যদিক, দেশের পূর্বাঞ্চলে এ ঋতুতে বজ্রঝড় অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও তাপমাত্রা কিঞ্চিত কম।

চিত্র ১.৩.১ ঃ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

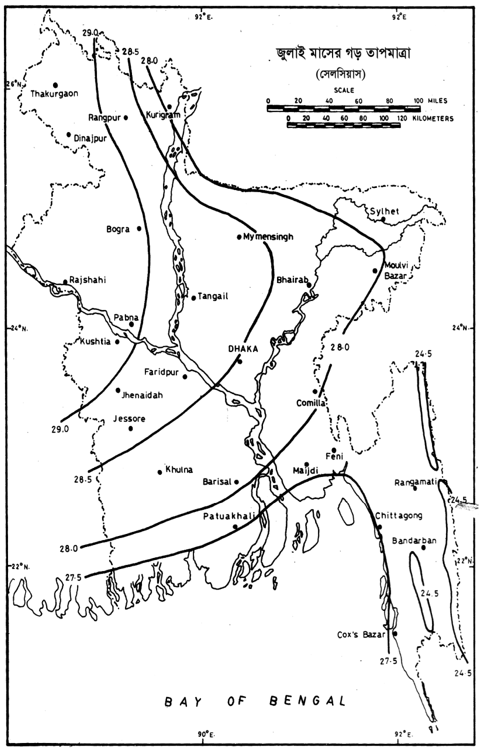

চিত্র ১.৩.২ ঃ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারী)

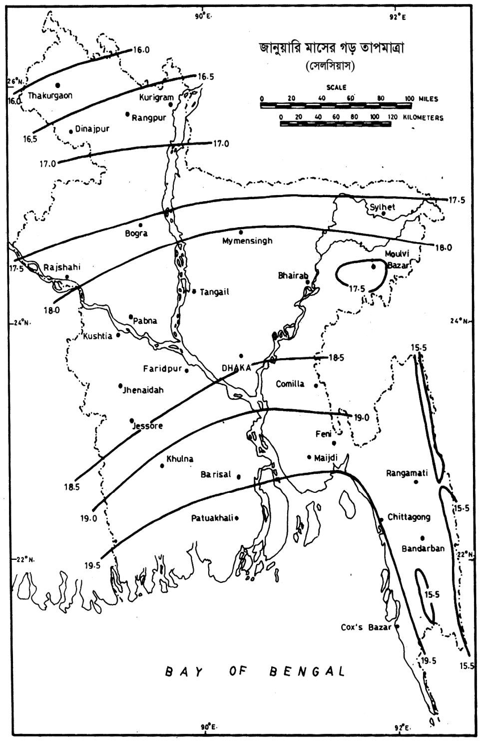

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১

খ. বৃষ্টিপাত (Rainfall) ঃ

বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের উৎস্য মুলতঃ তিনটি। এই তিনটি হলোঃ (i) শীতকালীন পশ্চিমা নিম্নচাপ জনিত বৃষ্টিপাত (western depression of winter), (ii) গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিমা বজ্রঝড় (early summer thunderstorm or Norwester) (iii) দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাত (Monsoon) (রশীদ, ১৯৯১)

(i) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের উৎস্য পশ্চিম দিক হতে আগত শীতল ও ভারী বায়ু। এই বায়ু হিমালয় পাদদেশে আসাম ও বাংলাদেশে শীতকালে অর্থাৎ মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৩০/৩৫ দিন বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১ সে.মি. (কক্সবাজার) থেকে উত্তরাঞ্চলে ৪ সে.মি. (শ্রীমঙ্গল) বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে (রশীদ, ১৯৯১)

(ii) গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাংলাদেশে বজ্রঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কালবৈশাখী নামে পরিচিত এই ঝড়ের আগমন যে কোন দিক হতে সংঘটিত হলেও মূলতঃ উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক হতে আসে বলে একে **উত্তর-পশ্চিমা বজ্রঝড়** অভিহিত করা হয়। কালবৈশাখী ঝড় নানা কারণে সংঘটিত হলেও প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর সংঘর্ষের ফলে বজ্রঝড়সহ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

চিত্র নং ঃ ১.৩.৩ : বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত

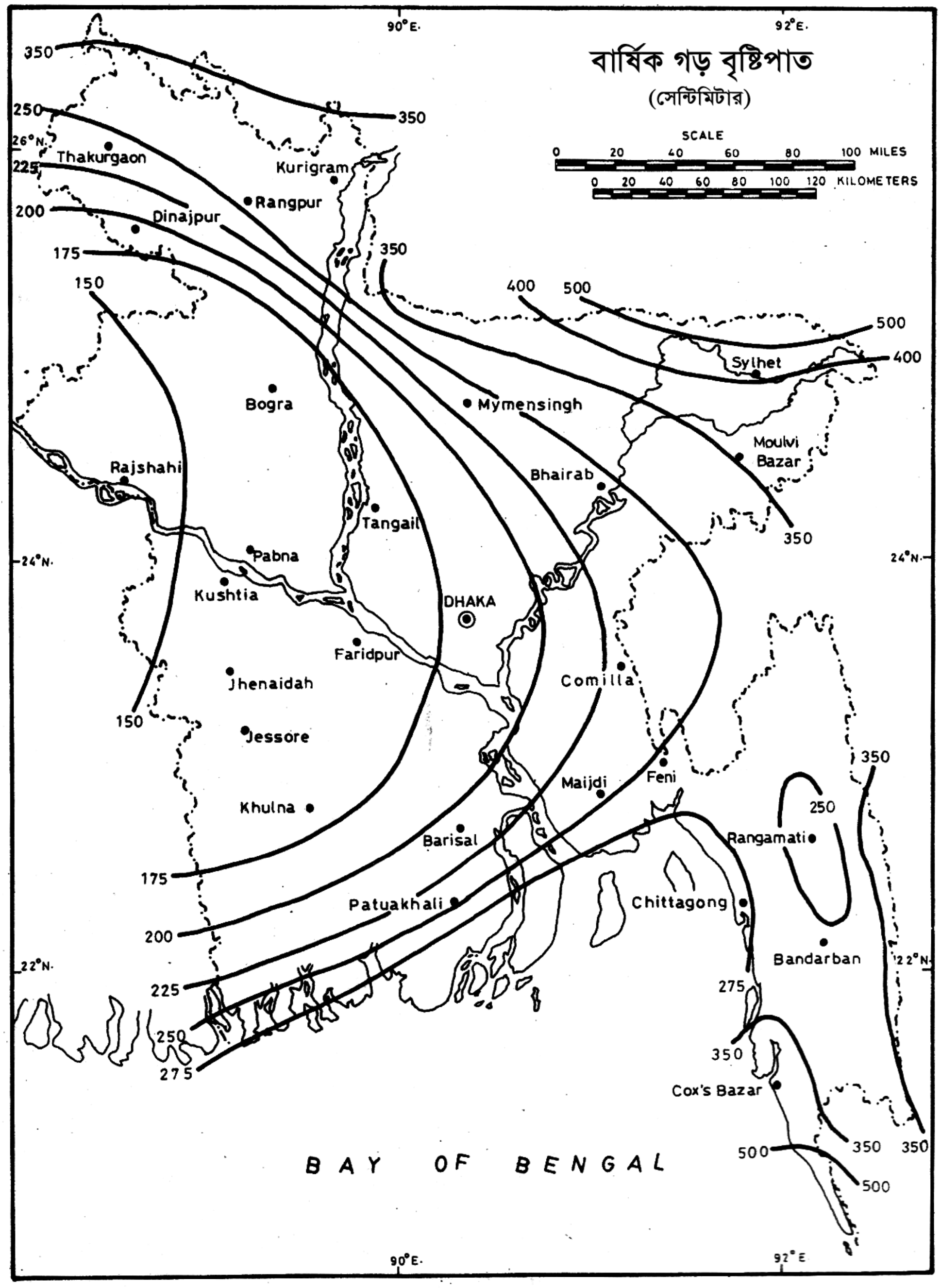

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১

কালবৈশাখী ঝড় -এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত। বজ্রপাত ও ঝড়ো বায়ুপ্রবাহ (গড়ে ১০০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায়) বিশিষ্ট এই কালবৈশাখী সাধারণত মার্চ মাসে আবির্ভূত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারী মাসেও আবির্ভূত হয় (চৌধুরী, ১৯৯৫)। আবার মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই

বজ্রঝড় সংঘটিত হলেও জুন মাসে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে কালবৈশাখী অর্ন্তনিহিত হয়ে যায়।

(iii) জুন মাসে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাত (Monsoon Rain)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্ষার আগমন হয়। এ ঋতুতে উষ্ণ ও জলীয়বাস্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম বানিজ্য বায়ু (south-west trades) অত্যন্ত উত্তপ্ত ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপাসগরে পৌঁছে। এই উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু পরিচলন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিছুটা উর্ধ্বে উঠে আরও উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই আর্দ্র বায়ু মায়ানমার সীমান্তে আরাকান-ইয়োমা পর্বত, উত্তরে মেঘালয় মালভূমি এবং হিমালয় পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। দেশের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, যেমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৮০ মিলিমিটার, ঢাকা ১৮৩০ মি.মি. এবং পাবনায় ১৫০০ মি.মি. (চৌধুরী, ১৯৯৫)। এ সময়ে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী এলাকায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কক্সবাজারে ৩৫৫৬ মি.মি. এবং সিলেটে ৩৯৮৮ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালে সংঘটিত হয়। এ সময়ে বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে থাকে। বর্ষাকলে প্রবাহিত দক্ষিণ পশ্চিম বাণিজ্য বায়ুর অপর নাম মৌসুমী বায়ু (South-West Trades)। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এ সময়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় বলে এই সময়ের জলবায়ুকে মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়।

সারণী ১.৩.১ ঃ বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের মাসিক গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত, ১৯৯৭

বিভাগীয় শহর	তাপমাত্রা (সেমি)		বৃষ্টিপাত (মিমি)
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	
চট্টগ্রাম	৩২.৫	১৪.১	৩০৬৯
সিলেট	৩২.৭	১২.১	-
ঢাকা	৩৩.৭	১১.৫	১৪৫৫
বরিশাল	৩৩.৪	১০.৮	১৭৬০
খুলনা	৩৪.২	১০.৯	১৮১৮
রাজশাহী	৩৬.৪	৮.০	২০০৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ, ১৯৯৯

গ. কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা, শিশির ও তুহিন (Fog, Mist, Dew and Hoar-Frost)

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকা এক সাধারণ চিত্র। এ সময়ে ঘন কুয়াশা ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদী, সিলেট জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দুইমাসে শিশির পাতের পরিমাণ ও অনেক বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গে শীতকালে তুহিনপাত হয়ে থাকে।

আর্দ্রতা (Humidity) ঃ

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর বায়ুতে আর্দ্রতার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ সবচাইতে কম।তবে দেশের পূর্বাঞ্চলে সবচাইতে কম আর্দ্রতার উপস্থিতি জানুয়ারি, ফ্রেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে (ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় ৫৮.৫% ভাগ) দেখা যায়। বাংলাদেশে সারা বছরের গড় আর্দ্রতা কক্সবাজারে ৭৮.১০% ভাগ ও পাবনায় ৭০.৫০% ভাগ (রশীদ, ১৯৯১)।

বায়ুপ্রবাহ (Winds) ঃ

শীতকালে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম দিক থেকে, পূর্বাঞ্চলে উত্তর দিক থেকে এবং উত্তরাঞ্চলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশের পশ্চিমার্ধে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। অপর দিকে, এ সময়ে দেশের পূর্ব দিকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ সময়ে সংঘটিত কালবৈশাখী ঝড় বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তন করে বিরাজমান উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় স্বস্তি দান করে। জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে বায়ু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অক্টোবরে বায়ুপ্রবাহের দিকে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বায়ুর

প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুর সর্বনিম্ন আর্দ্রতা (৩৬% ভাগ) বজায় থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় মধ্যভাগ বরাবর কর্কট ক্রান্তীয় রেখা (Tropic of Cancer) অতিক্রম করেছে। গ্রীষ্মকালে ক্রান্তীয় রেখা বরাবর সূর্যরশ্মি খাড়া ভাবে পতিত হওয়ায় ঐ এলাকার বায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা হয়ে উর্ধ্ব দিকে প্রবাহিত হলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত বায়ু অর্ন্তনিহিত হয়ে যায়। ফলে ঐ স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়ে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত এই বায়ু প্রবাহ মূলতঃ দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর সম্প্রসারিত অংশ, যা নিরক্ষরেখা অতিক্রম বরাবর সময়ে ফেরেলের সূত্রানুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে শীতকালে সাধারণতঃ উত্তর দিক হতে এবং গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালী বজ্রঝড় (বায়ুর গতিবেগ ৫০-১০০ কি.মি./ঘন্টা) ও প্রাক বর্ষা ও বর্ষাকাল উত্তর সময়ে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং গ্রীষ্মকালে প্রায়শঃ সংঘটিত টর্নেডো ব্যতীত বাংলাদেশে সারা বছর মৃদু বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়।

বায়ুমন্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure) ঃ

মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকালে বাংলাদেশে বায়ুমন্ডল অত্যন্ত শীতল ও ভারী হয়ে থাকে। জানুয়ারি মাসে বায়ুমন্ডলের গড় চাপ ১০২০ মিলিবার পর্যন্ত পৌঁছে। এই সময়ে উত্তর পূর্বে চীন ও সাইবেরিয়া থেকে শীতলতর বায়ু প্রবাহ ব্রক্ষ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকা দিয়ে উত্তর দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাসে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর আবহাওয়ার ফলে এ সময়ে বায়ুমন্ডল উষ্ণ ও হালকা (১০০৫ মিলিবার) হয়ে থাকে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু এ সময়ে বাংলাদেশের আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তোলে। মে-জুন ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বায়ুপ্রবাহের দিক ও সেই সঙ্গে বায়ুমন্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ঘটায় এ সময়ে প্রায়শঃ ঝড়ো আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বজ্রঝড়, ক্রান্তীয় ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ এই সময়কালে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ ঃ

বাংলাদেশের জলবায়ু যথেষ্ট্য বৈচিত্র্যময়। এদেশে ছয়টি ঋতুর প্রত্যেকটি পৃথক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এই পাঠে আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধান তিনটি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক) **শীতকাল ঃ** সূর্যের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থানের ফলে, বাংলাদেশে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, কোন কোন সময়ে মার্চ মাস পর্যন্ত শীতকাল বিরাজ করে। এ সময়ে গড়ে সর্বোচ্চ ২৯$^{\circ}$ সে. থেকে সর্বনিম্ন ১১$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আকাশ মেঘমুক্ত ও নির্মল থাকে, বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণও কম থাকে। রাতের বেলা শিশিরপাত ও সকাল বেলায় কুয়াশাছন্ন আকাশ শীতকালের বৈশিষ্ট্য। জানুয়ারি মাস শীতকালের শীতলতম মাস (গড় তাপমাত্রা ১৭.৭$^{\circ}$ সে.)। জানুয়ারি মাসে দেশের দক্ষিণাংশে চট্টগ্রামে ২০$^{\circ}$সে., মধ্যম অবস্থানে ঢাকায় ১৮.৩$^{\circ}$ সে. এবং উত্তরাংশে দিনাজপুরে ১৬.৬$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। তবে দেশের একেবারে উত্তরে তাপমাত্রা ৮$^{\circ}$ সে. বা তারও নীচে ৫$^{\circ}$ সে. এ নেমে আসে। এ সময়ে রাজশাহীতে ৫$^{\circ}$ সে. ও ইশ্বরদীতে ৬$^{\circ}$ সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় (সারনী ১.৩.১)। শীতকাল বেশ উপভোগ্য, শীতল ও আরামদায়ক হলেও কোন কোন সময়ে তীব্র শীতের প্রকোপ জনজীবনে দূর্ভোগ বয়ে আনে।

খ) **গ্রীষ্মকাল ঃ** মার্চ মাসের মধ্যভাগ থেকে মে/জুন মাস সময়ে কালে সূর্য্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে। ফলে এ সময়ে বাংলাদেশে সূর্যরশ্মি খাড়া ভাবে পতিত হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই সময়কাল গ্রীষ্মকাল নামে পরিচিত। উষ্ণ আর্দ্র মেঘমুক্ত আবহাওয়া, কখনও কখনও তাপ প্রবাহ (Heat wave), অপরাহ্নে বৃষ্টিপাত ও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কালবৈশাখী ঝড় এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য। এ সময়ে দেশের দক্ষিনাঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) তাপমাত্রা গড়ে ৩০.৪$^{\circ}$ সে. হলেও তাপমাত্রা উত্তরদিকে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। দেশের মধ্যভাগে ঢাকায় তাপমাত্রা ৩৪$^{\circ}$ সে. এবং আরও উত্তরে ঈশ্বরদী (৪৩$^{\circ}$ সে.) ও রাজশাহী (৪৪$^{\circ}$ সে.) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

গ) **বর্ষাকাল ঃ** জুনের মধ্যভাগ হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্ষাকাল। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০ভাগ বৃষ্টি এই ঋতুতেই হয়ে থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হতে আগত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এই ঋতুতে গড় তাপত্রামা সর্বোচ্চ ৩১° সে. নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, আর্দ্র বাতাস, এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এই ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো বছরে অতিবৃষ্টির কারণে বণ্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তাপমত্রার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ গ্রীষ্ম প্রধান এই দেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মধ্যম মাত্রার তাপমাত্রা এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ কম থাকে অর্থাৎ এ সময়ে শীত কাল বিরাজ করে।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল সমূহ:

ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের জলবায়ুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সনাক্ত পূর্বক জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ এদেশেকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ভ-াদিমির কোপেন স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation), মাসিক গড় তাপমাত্রা (mean temperature), গড় বারিপাত (precipitation) ও বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (mean annual temperature)-এর ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে,বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শুষ্ক শীতকাল ও আর্দ্র উপক্রান্তীয় (Cwa) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অন্যদিকে, দেশের বাকী অংশ ক্রান্তীয় মৌসুমী (Am) জলবায়ুর অন্তর্গত। নিম্নে বাংলাদেশের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী জলবায়ুর শ্রেনীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হ'লো।

১। **প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ ঃ** তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে মোট সাতটি জলবায়ু উপ-অঞ্চলে (sub-zone) বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো ঃ (i) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (ii) উত্তর-পূর্বাঞ্চল (iii) উত্তরের উত্তরাঞ্চল (iv) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (v) পশ্চিমাঞ্চল (vi) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (vii) দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল।

২। **অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঃ** বাংলাদেশকে সাধারণভাবে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত উল্লেখ পূর্বক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ইত্যাদির ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো ঃ

(i) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় শুষ্কপ্রায় জলবায়ু (Tropical- Subtropical Semi-arid Climate)
(ii) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় আর্দ্রপ্রায় জলবায়ু (Tropical- Sub Humid Climate)
(iii) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (Tropical- Humid Climate)
(iv) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু (Tropical- Maritime Climate)
(v) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল (Tropical Wet Climate)
(vi) উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল (Subtropical Wet Climate)

৩। **প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলাম ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পানি ঘাটতির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ (i) আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল পূর্বাঞ্চল, (ii) শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন পশ্চিমাঞ্চল, (iii) অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি, কম তাপমাত্রা, ও কম পানি ঘাটতি সম্পন্ন মধ্য অঞ্চল।

৪। **প্রফেসর নাফিস আহমেদ ঃ** বাংলাদেশকে সাধারণভাবে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ (i) মহাদেশীয় (ii) উন্নত মহাদেশীয় (iii) নাতিশীতোষ্ণ (iv) সামুদ্রিক (v) শীতল বৃষ্টিবহুল ও (vi) পাহাড়ী অঞ্চল।

জলবায়ুর উপরোক্ত সকল শ্রেনীবিভাগের মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট ভূগোলবিদ **প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ** কর্তৃক উপস্থাপিত জলবায়ুর অঞ্চল ভিত্তিক শ্রেনীবিভাগটি সর্বাধিক প্রযোজ্য হওয়ায় এখানে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হ'লো।

ক) **দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South-Eastern Climatic Region):** চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী, দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন ও তদসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকা এবং কুমিল্লা জেলার দক্ষিনাংশ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত, ৩০০ মিটারের অধিক উচ্চতর পাহাড়গুলো 'খ' ধরনের জলবায়ুর অন্তর্গত। বাকী অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৩° সেঃ থেকে ৩২° সেঃ পর্যন্ত উঠানামা করে। পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ায় অধিক পরিমানে বৃষ্টিপাত (২৫৪

সে. মি.) হয়ে থাকে। শীতকালে শিশিরপাতের পরিমানও বেশী হয়ে থাকে। কোপেন -এর শ্রেনীবিভাজন অনুযায়ী এই অঞ্চলটি AM শ্রেনীর অন্তর্গত।

(খ) **উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল** (North-Eastern **Climatic Region**) ঃ সিলেটের পূর্ব ও দক্ষিণের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এবং উত্তরাংশে মেঘালয়ের দক্ষিণের একটি সংকীর্ণ অঞ্চল এ ধরনের জলবায়ুর অন্তর্গত। এই অঞ্চলে সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩২° সে. পর্যন্ত পৌছালেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০° সে. অথবা আরও নীচে নেমে যায়। গড় আর্দ্রতা **'ক'** অঞ্চলের তুলনায় অধিক। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমান সর্বাধিক (গড়ে ৩৪০০ থেকে ৪৬০০ মিলিমিটার)। তবে সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত ৫৮০০ মিলিমিটার সমবর্ষণ রেখা (Isohyet Line) অতিক্রম করে। উঁচু পাহাড়ের অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলের আকাশ সারা বছরই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। শীতকালীন বৃষ্টি ও কুয়াশার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামে ৩০০ মিটারের অধিক উচ্চতার পাহাড়ী এলাকা এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

(গ) **উত্তরের উত্তরাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (Northern Part of Northern Climatic Region)** ঃ বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই উপ-অঞ্চলের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে গড়ে ৩২° সে. এর উর্ধ্বে পৌছায়। অন্যদিকে শীতকালে গড় তাপমাত্রা ১০° সে.-এর নীচে নেমে যায়। শুষ্ক ও তীব্র গরম পশ্চিমা বায়ু গ্রীষ্মকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমান অধিক (২০০ থেকে ৩০০ সে. মি.)। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমানে ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের কারণে এই অঞ্চলকে চরমভাবাপন্ন (extreme) জলবায়ুর অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ১.৩.৪ ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল সমূহ

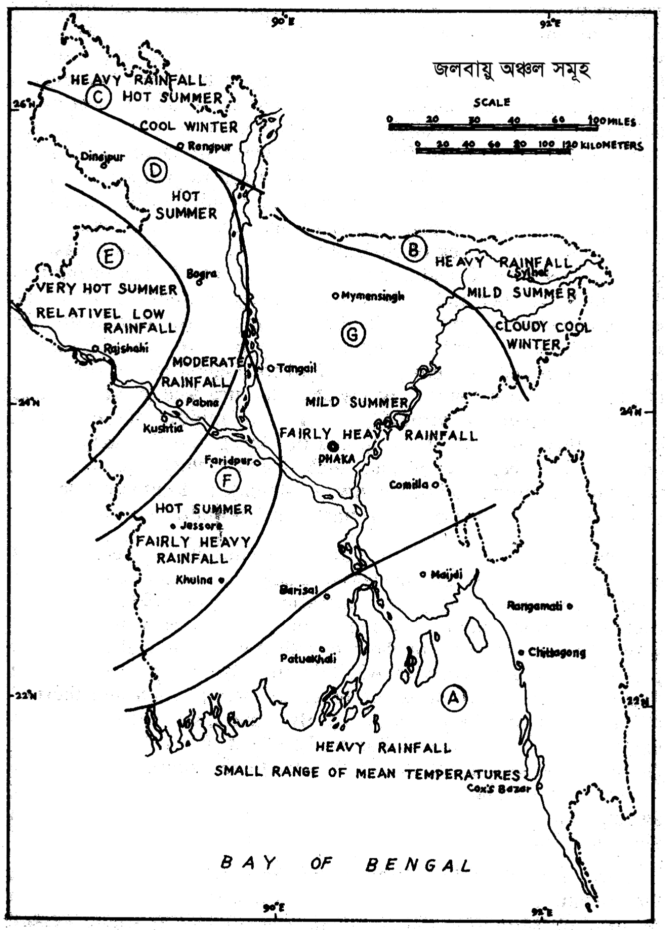

উৎস্য: হারুন অর রশীদ. ১৯৯৯

(ঘ) **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (North-Western Climatic Region)** দিনাজপুরের দক্ষিনাংশ, বগুড়া, পাবনা ও কুষ্টিয়ার কিয়দংশ এই জলবায়ুর অন্তর্গত। এই উপ-অঞ্চলের জলবায়ু 'গ' উপঅঞ্চলের জলবায়ুর সাথে সথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এই উপ-অঞ্চলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমানে ঋতুভিত্তিক পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। বৃষ্টিপাতের পরিমান কম হওয়ায় এই উপ-অঞ্চলটির আবহাওয়া ও মৃত্তিকার ধরন শুষ্ক প্রকৃতির।

(ঙ) **পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (Western Climatic Region)**: রাজশাহী ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার কিয়দংশ এই ধরনের জলবায়ু উপ অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা উষ্ণ ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল বিশিষ্ট উপ-অঞ্চল (subzone) গ্রীষ্মকালে এখানকার তাপমাত্রা ৩৫° সে. এর উর্ধ্বে পৌঁছায়। বায়ুর আর্দ্রতার পরিমান শতকরা ৫০ ভাগের কম হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ১৫০ সে. মি. নীচে বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট এই উপ-অঞ্চলটি বাংলাদেশের শুষ্কতম এলাকা।

(চ) **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South-Western Climatic Region)** : যশোহর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ও খুলনা জেলার কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এই উপঅঞ্চলের জলবায়ু উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য উপ-অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত কম চরমভাবাপন্ন (extreme)। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩৫° সে. এবং বৃষ্টিপাত ১৫০-১৮০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশ্চিমাঞ্চলীয় উপ-অঞ্চল অপেক্ষা এই এলাকায় শীতকালে অধিক শিশিরপাত হয়ে থাকে।

(ছ) **দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South Central Climatic Region)** : ঢাকা বিভাগসহ কুমিল্লা, ও বরিশালের অধিকাংশ স্থান এই উপঅঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এখানে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টিপাত (১৯০ সি. মি.) হয়ে থাকে। তাপমাত্রা পশ্চিমাঞ্চলীয় উপঅঞ্চলসমূহের (ঘ, ঙ, চ) তুলনায় কম হলেও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় (ক) এলাকা অপেক্ষা অধিক। এই উপঅঞ্চলটি মূলতঃ ক, ঘ ও চ জলবায়ু উপঅঞ্চলগুলোর মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। এই অঞ্চলটির পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ ও শুষ্ক এবং পূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির জলবায়ু বিশিষ্ট। জলবায়ুর পরিবর্তনটি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় বলে এই অঞ্চলকে পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Transitional Zone) বলা হয়। দেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় পরস্পর বিপরীতধর্মী তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, ও বৃষ্টিপাত এই উপঅঞ্চলে মিলিত হওয়ার ফলে শিলাবৃষ্টি (Hail-Storm), কালবৈশাখী ঝড় (Nor'westers), এবং টর্নেডো (Tornado) জাতীয় প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যাবলী

বাংলাদেশের জলবায়ুতে উচ্চ তাপমাত্রা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঋতুগত উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন।
২) বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় জলবায়ু অথবা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত।
৩) বাংলাদেশের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতা ও শীতকালে শুষ্কতা পরিলক্ষিত।
৪) এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও স্বাভাবিক বন্যার পাশাপাশি কয়েক বছর পরপর অস্বাভাবিক বন্যা।
৫) বাংলাদেশের ৬টি ঋতু থাকলেও মূলতঃ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এ তিনটি ঋতুর প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৬) বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র হলেও স্বল্প বৃষ্টিপাত ও মাঝে মাঝে কাল-বৈশাখীর মত প্রলয়ংকারী ঝড় সংঘটিত হয়।

পাঠ সংক্ষেপঃ

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানকার জলবায়ুর আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুষ্ক আরামদায়ক শীতকাল, উষ্ণ ও গুমোট গ্রীষ্মকাল আর আর্দ্র ও উষ্ণ বর্ষাকাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

ক) কোন অঞ্চলের জলবায়ু বা তার যে কোন .... একক বা .... সে অঞ্চলের জীবজন্তু, ... মানুষ ইত্যাদির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে থাকে।

খ) বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের মূল উৎস্য .... ।

গ) গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাংলাদেশে .... ও বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ঘ) বাংলাদেশে .... থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকা এক সাধারণ চিত্র।

ঙ) বাংলাদেশের সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাতে শতকরা .... ভাগ বর্ষাকাল-এ সংঘটিত হয়।

২. **সঠিক বাক্যের পাশে ‘স’ ও অঠিক বাক্যে ‘মি’ লিখুনঃ**

ক) কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ বরাবর অতিক্রম করেছে।

খ) বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি জলবায়ুর উপাদান।

গ) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের উৎস্য বঙ্গোপসাগরের থেকে আগত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ।

ঘ) ফেরেলের সূত্রানুযায়ী বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

ঙ) পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চলের অপর নাম পরিবর্তনশীল অঞ্চল।

সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

১. জলবায়ু কি বা জলবায়ু বলতে কি বুঝেন? এর বিভিন্ন উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের মূল উৎস্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. বাংলাদেশের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

৫. বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু এলাকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬. বাংলাদেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলীয় জলবায়ু বিশদভাবে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের জলবায়ু ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ন্ত্রকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণীবিভাজন (হারুন-অর-রশীদ অনুসরনে) করুন এবং যে কোন ২টি অঞ্চল আলোচনা করুন।

পাঠ-১.৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন

(Population Planning and Development of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক; এবং
- জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ যার জনাধিক্যজনিত সমস্যাই মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ক্ষুদ্র পরিসরের এই দেশটির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে উচ্চ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭২ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার লোক সংখ্যা ছিল ২.১৭ কোটি। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে সেই ১৯০১ সালের ২.৮৯ কোটি লোক নানান চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে (২০০৫) প্রায় ১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে (২০০১ সালের উপর অনুমেয়)। এ দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৮৩৩ জন, যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান। বর্তমানে বাংলাদেশের জন্ম হার ১.৫৩% এবং এ ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটিতে উন্নীত হবে যা হয়তো হবেএ ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়। সামগ্রীকভাবে যার ছোবল পড়বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর। তাই এখনই উপযুক্ত সময়, এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি প্রবণতাকে রোধ করার মানসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বাবহার নিশ্চিত করা। আলোচ্য পাঠে আমরা তাই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১২,৩৮,৫১,১২৩ জন, যা দেশের মোট আয়তন অনুসারে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় ৮৩৯ জন। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত সমতল পলল সমভূমি যা পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন প্রধান নদী ব্যবস্থার অসংখ্যক শাখা ও উপনদীসহ শত শত পুকুর জলাশয় এবং বিল ও হাওড় সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং সে প্রক্রিয়া এখনও সক্রিয়। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত এই দেশের অধিকাংশ মাসেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে চিরসবুজ উদ্ভিদের আধিক্য বিদ্যমান। এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমির উপস্থিতির দরুন বহুকাল পূর্ব থেকেই এদেশে কৃষি কর্মকান্ড প্রসার লাভ তথা অন্যতম পেশা হিসেবে পরিগণিত। অন্য দিকে অতীতের শিল্পায়নে খুব কমই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাই সম্ভবতঃ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক নীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, দরিদ্র বিমোচন এবং টেকসই আর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশে কৃষির ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষি ও কৃষি সংশি- ষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল। ফলে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সার্বিকভাবে সনাক্ত করা যায়, যেমনঃ

ক) বাংলাদেশের আয়তন ক্ষুদ্র এবং সম্পদ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাই প্রতি নিয়ত সীমিত সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে অবিবেকের মত, তাতে থাকছে না কোন সুষম পরিকল্পনা ও বিলি বন্দেজ।

খ) এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নিরক্ষর ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। যাদের অধিকাংশরই অবস্থান দরিদ্র সীমার নীচে।

গ) বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের পরিমাণ ০.১০ শতাংশ মাত্র অথচ পৃথিবীর ২.৫ শতাংশ মানুষ এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডে বসবাস করছে। ফলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর ভিতর সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া বসতি সম্প্রসারণ, গৃহনিমাণ, পথঘাট তৈরি নিমিত্তে বনভূমি প্রায় নির্মূল হতে চলেছে। অথচ বাংলাদেশের আর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে আজও কৃষি এক চেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সেক্টর এর মধ্যে শস্য জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রটি অন্যান্য দেশের তুলনায় আনুপাতিক হারে বেশি বিস্তৃত। তাই এমন অবস্থায় দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন।

ঘ) বাংলাদেশের আর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি দারিদ্র, বেশি নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ পীড়িত ও তার ক্ষতি প্রভাবিত।

ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো যেমন- কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মূলতঃ শহর এলাকায় কেন্দ্রিভূত।

চ) দেশের উৎপাদিত পণ্যের বন্টন ব্যবস্থায় রয়েছে নানা রকম ক্রটি।

ছ) দেশের জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান বিধায় নর-নারীর মধ্যে অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্তি ঘটে থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধন ঘটে, ফলে জন্মহার বেশি হয়ে থাকে।

জ) বাংলাদেশের লোকজন বেশির ভাগ সময় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যা প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অধিক সন্তান জন্মদানের বেশি সহায়ক। ফলে লোকসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আমিষ জাতীয় খাদ্যাভাব প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একে অপরের সম্পূরক। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত জন বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন দেশের নানা জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ, যথাঃ মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, কর্মসংস্থানের অভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিতিশীলতা, স্বল্প বিনিয়োগ ও মূলধন গঠন, অদক্ষ শ্রমশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস, জমাজমির খন্ড বিখন্ডতা সৃষ্টিসহ নানা বাধাবিপত্তি বিদ্যমান। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রকার আর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, নানাবিধ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরাসরি উৎপাদন কর্মকান্ডে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে জনগণকে সুদক্ষ জনশক্তি রূপে রূপান্তর তথা সঠিক সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ব্যবহারযোগ্য করে সে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন। তাহলে সার্বিকভাবে তাদেরকে দেশের সকল ধরনের কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্প্রসারণ তথা দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে আশাব্যক্ত করা যায়। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুধাবন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ অতি জরুরী, যেমনঃ

১) সর্বাগ্রে দেশের সকল ধরনের অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী জনগণকে শিক্ষিত করে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তা নিমিত্তে-

ক) ৫ থেকে ১৫ বছরের সকল ধরনের শিশুকে স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ আবশ্যক; প্রয়োজনে আকৃষ্ট করার মানসে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক (যা বর্তমানে প্রচলিত) দান, টিফিনের ব্যবস্থা করণ, বিনা পয়সায় পড়াশুনার সুযোগ ইত্যাদি বহাল রাখতে হবে।

খ) বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী জনগণকে ন্যুনতম স্তরের জ্ঞান কর্মসূচীর আওতাধীনে এনে তার নিমিত্তে নৈশ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠাগার ইত্যাদি সহজ প্রাপ্যতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের যোগ্যতা ভিত্তিক চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) গরীব ছেলেমেয়েদের পিতা মাতাদেরকে মাসোয়ারা বা এককালীন এমন ধরনের অনুদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে স্কুল কলেজে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন।

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে যদিও আইন রয়েছে, তবে তা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

ক) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

খ) বিলম্বে বিবাহ উৎসাহিত করতে হবে।

গ) বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ; যেমনঃ

- অস্থায়ী ভিত্তিতে নানা প্রকার পিল ব্যবহার, কনডম ব্যবহার, ইনজেকশন গ্রহণ, আজল, সময় বিরতি মেনে চলা ইত্যাদি।
- স্থায়ী ভিত্তিতে ভ্যাসেকটমী, লাইগেশন, এমআর ইত্যাদি।

ঘ) শিশু মৃত্যুহার প্রসূতি মৃত্যুহার জন্মহার ইত্যাদি কমানো।

ঙ) প্রসূতি সেবাদান ও মাতৃসদনের মান উন্নত ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৩। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ জনগণের পুনর্বাসন যে সব এলাকায় লোকসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার উপরে সে সব এলাকার লোকজনকে যেখানে কম বসতি, বসতিহীন ইত্যাদি স্থানে পুনঃ বাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনঃ বন্টন করতে হবে, তবে তা সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

৪। মূলতঃ নদী ভাঙ্গন ও গ্রামীণ এলাকার গরীব লোকজন কর্মসংস্থানের কারণে শহরে যেয়ে বস্তি জীবন বেছে নেয়। তাই বস্তি বাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ যাতে তারা বস্তি বাসী না হয় এবং তার জন্য গ্রামীণ এলাকার টেকসই উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা তাতে আকৃষ্ট থাকে।

৫। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বাস্তহারা (Refugee) সমস্যা একটি প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ঘটনাচক্রে বার্মা থেকে রোহিঙ্গাদের আগমন। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতাবস্থার মাধ্যমে।

৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ বর্ধিত জনসংখ্যা সার্বিকভাবে নগরীয় পরিবেশ সহ দেশের পরিবেশ অবনতির জন্য দায়ী। সুতরাং দেশের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নগরসহ দেশের সকল স্থানের পরিবেশীয় উন্নতি সাধনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অগ্রসর হতে হবে (যেমন বৃক্ষ কর্তন নিষিদ্ধকরণসহ রোপনে উৎসাহদান)।

পাঠসংক্ষেপঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ যার জনাধিক্যজনিত সমস্যাই মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ক্ষুদ্র পরিসরের এই দেশটির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে উচ্চ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭২ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার লোক সংখ্যা ছিল ২.১৭ কোটি। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে সেই ১৯০১ সালের ২.৮৯ কোটি লোক নানান চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে (২০০৫) প্রায় ১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে (২০০১ সালের উপর অনুমেয়)। এ দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৮৩৩ জন, যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান। বর্তমানে বাংলাদেশের জন্ম হার ১.৫৩% এবং এ ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটিতে উন্নীত হবে যা হয়তো হবেএ ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়। সামগ্রীকভাবে যার ছোবল পড়বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর। তাই এখনই উপযুক্ত সময়, এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি প্রবণতাকে রোধ করার মানসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বাবহার নিশ্চিত করা। এই পাঠটি পড়ে আপনি বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক; এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সঠিক উত্তরে পার্শ্বে 'স' এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'মি' লিখুন।

১.১. বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ।

১.২. জনাধিক্যজনিত সমস্যাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা।

১.৩. ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের গঠন প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত।

১.৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল।

১.৫. অতি দারিদ্র, বেশি নির্ভরশীখল ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও তার ক্ষতিগ্রস্থতাই বাংলাদেশের আর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।

২.শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

২.১. বাংলাদেশের আয়তন ক্ষুদ্র ও .... সীমিত।

২.২. বাংলাদেশের লোকজন বেশির ভাগ সময় .... জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যা প্রজনন .... বৃদ্ধিসহ অধিক .... জন্মদানের বেশি .....।

২.৩. বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে .... পরিকল্পনা গ্রহণ।

রচনাম   লক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি নিবদ্ধ লিখুন।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিকসমূহ আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সুপারিশমালা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-১

পাঠ-১.১

১.১ বঙ্গ

১.২ ১৯৪৭

১.৩ ৭

১.৪ উপজেলা, জেলা

১.৫ তত্ত্বাবধানে

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ঠিক এবং অঠিক উত্তর উপত্তরের পার্শ্বে অঠিক লিখুন

২.১ ঠিক, ২.২ অঠিক, ২.৩ অঠিক, ২.৪ অঠিক, ২.৫ ঠিক

পাঠ-১.২

১.১ √, ১.২. √, ১.৩. √, ১.৪. √, ১.৫. √, ১.৬. √, ১.৭. √, ১.৮. √, ১.৯. √, ১.১০. √

২.১. এই

২.২. ১৯৫৪, ১৯৭৭, ২৪ এবং ৫৪

২.৩. কর্ণফুলী

২.৪. চত্বর, নিচু, উচু

২.৫. সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ

পাঠ-১.৩

১. ক. উপাদান, সম্মিলিতভাবে, উদ্ভিদ, খ. ৩ টি, গ. বজ্রপাত, ঘ. নভেম্বর, ঙ. চার

২. ক. স, খ.স, গ.মি, ঘ.স, ঙ.মি

পাঠ ১.৪

১.১. স, ১.২. স, ১.৩. স, ১.৪. স, ১.৫. স

২.১. উত্তরঃ সম্পদ, শ্বেতসার, ক্ষমতা, সন্তান, সহায়ক, পরিবার।

২.২. উত্তরঃ শ্বেতসার, ক্ষমতা, সন্তান, সহায়ক, পরিবার।

২.৩. উত্তরঃ পরিবার।